রুশফ্রণ্টে গুপ্তচর

চিরঞ্জীব সেন

পরিবেশক

সাহিত্যলোক। ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট। কলকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ : বঙ্গাব্দ ১৩৬৪

প্রকাশক : শ্রীসুপেনকুমার রায়
৫৭-বি ইন্দ্র বিশ্বাস রোড। কলকাতা ৩৭

প্রচ্ছদ : জান মহম্মদ

মুদ্রাকর : নেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিণ্টার্স। ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কলকাতা ৬

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে আসছে। রাশিয়ানরা বারলিনে ঢুকে পড়েছে বারলিন টানেলের ভেতরে বসে রাশিয়ান ট্যাংক থেকে প্রচণ্ড গোলা-বর্ষণ শুনতে পাচ্ছি। শহরটাকে ওরা বোধহয় ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে।

ওপরে শহরের বুকে কি চলছে জানি না কিন্তু এই টানেলের ভেতরে পচা মৃতদেহের দুর্গন্ধে তো টেকা যাচ্ছে না। টানেল থেকে বেরিয়ে ওপরেও যেতে পারছি না। কোনো রাশিয়ান সৈনিক আমাকে দেখতে পেলেই ক্যাঁক করে ধরবে। আর যদি কোনো জার্মান আমাকে দেখে সে তো সঙ্গে সঙ্গে গুলি করবে। আমার হয়েছে উভয় সংকট, এগোলেও নির্বংশের ব্যাটা, পেছলেও নির্বংশের ব্যাটা। ভাল করেই বুঝছি 'প্রাণ রাখিতে সদাই প্রাণান্ত'।

জার্মানরা একসময়ে ভাবত আমি ওদের হয়ে কাজ করছি। আমি কিন্তু খাস ইংরেজ, যুদ্ধের সময় জার্মানিতে আটকে পড়েছিলুম। কিন্তু জার্মানরা আমাকে কোনো বন্দী শিবিরে পাঠায়নি।

জার্মান রেডিও থেকে উইলিয়ম জয়েস নামে সেই ইংরেজ পুরুষটি স্বজাতির বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছিল। ইংরেজ শ্রোতারা নাম দিয়েছিল 'লর্ড হ হ'। জার্মানরা আমাকে উইলিয়ম জয়েসের তল্পিদার করে দিল, আমি জয়েসকে খবর সংগ্রহ করে দিতুম। এই ছিল আমার কাজ আর এই সুযোগে আমি কিছু স্যাবোটাজও করতুম। তবে ধরা পড়িনি এ কথা বলতে পারি না। বড় কোনো স্যাবোটাজ তো নয় তাই সতর্ক করে ছেড়ে দিয়েছিল কারণ ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে তাদেরও তো দু'একটা ইংরেজ চাই।

রাশিয়ানরা একদিন হুড়হুড় করে বারলিনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ইংরেজকে তারা হয়ত কিছু বলবে না। কিন্তু আমার বৌ যে জার্মান আর তার জন্যেই ত জার্মানিতে আটকে গেলুম।

অ্যানালিসা, মানে আমার যুবতী বৌ, সেও ভীষণ ভয় পেয়েছে।

কি পরিচয় দিয়ে রাশিয়ানদের হাত থেকে আমরা মুক্তি পাব? রাশিয়ান সৈনিকরা তখন ক্ষেপে আছে। দোষ দেওয়া যায় না। জার্মান সৈনিকরা তাদের ওপর বর্বরের মতো অত্যাচার করছে। তাদের পিঠে ছুরি মেরেছে। তাদের শহর বন্দর বাঁধ কারখানা ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে। শহরের গ্রামের বাড়িতে ঢুকে অসহায় নারীর ওপর অত্যাচার করেছে।

এইজন্যেই বোধহয় পাল্টা আক্রমণে রুশ সৈন্যরা প্রতিশোধ নেবার সুযোগ পেয়ে হিংস্র ও নির্মম হয়ে উঠেছে। তারা বুঝি ক্ষেপে গেছে।

নানা ধরনের বোমা বর্ষণের ফলে টানেলটা মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে।

সহসা অ্যানালিসার চিৎকার ও সকরুণ আর্তনাদে আমি চমকে উঠলুম সে কাতরস্বরে অনুরোধ করছে, না, না, দয়া কর, ছেড়ে দাও...।

আমি লাফিয়ে উঠলুম। দেখলুম টানেলের প্রবেশ মুখে তিন নরপশু অ্যানালিসাকে মাটিতে ফেলে দিয়েছে। একজন তার স্কার্ট ধরে টানছে, একজন ব্লাউস খোলবার চেষ্টা করছে, অন্য একজন তার হাত দুটো ধরে আছে, অ্যানালিসা তার দুই পা ছুঁড়ছে। এ কি কাণ্ড

আমি ছুটে যেয়ে একটার ঘাড়ে সজোরে এমন ঘুঁসি মারলুম যে, সে এক ঘুঁসিতেই কাৎ আর অপর দুটোর ঘাড় ধরে মাথায় মাথায় এত জোরে ঠুকে দিলুম যে তারা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

বাল্যকাল থেকে কুস্তি, বক্সিং, জিমন্যাস্টিক করে শরীরকে শক্তিশালী করেছিলুম। এই শক্তি আমাকে অনেক সাহায্য করেছে।

টানেলে আরও তো লোক ছিল কিন্তু আসন্ন বিপদের মুখে এবং সব হারিয়ে তারা কি রকম হয়ে গেছে যেন। আর তারা কিই বা করত হয় তারা নারী কিংবা বৃদ্ধ বা আঘাত-প্রাপ্ত পুরুষ। যে কজন যুবক ব বালক তখনও বেঁচে আছে তারা সবাই তো যুদ্ধক্ষেত্রে।

অ্যানালিসা উঠে দাঁড়িয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, চল চল

আমরা এখান থেকে পালাই, রাশিয়ানরা আর দু'ঘণ্টার মধ্যে এখানে এসে পড়বে, আমার কাছে আমাদের দু'জনের পরিচয়পত্র আছে।

ঐ তিনটে নরপশু কিন্তু রাশিয়ান। লুঠপাট বা নারীনির্যাতন করবার জন্যে দল থেকে ছিটকে এসেছে। তবে সংখ্যায় এরা বোধহয় বেশি নয়। যাইহোক আমি কাছে না থাকলে ঐ নরপশু তিনটে অ্যানালিসাকে নিশ্চিত ধর্ষণ করে মেরেই ফেলত। খুব বেঁচে গেছে।

অ্যানালিসার পরামর্শ শুনে আমরা তখনি স্থানত্যাগ করলুম। সামান্য দু'একটা জিনিস যা সঙ্গে ছিল সেগুলো গুছিয়ে নিয়ে আমরা অলিগলি ঘুরে অবাঞ্ছিত সৈনিকদের দৃষ্টি এড়িয়ে একটা সরকারী আস্তানায় এসে পৌঁছলুম।

বাড়িটা বেশ বড় তবে বোমাবর্ষণে অনেকটা ভেঙে পড়েছে। একটু লক্ষ্য করতেই দেখলুম বাড়িটার মাটির নিচে যে বড় সুরাভাণ্ডার বা সেলার ছিল সেখানে ছোটখাটো একটা হাসপাতাল খোলা হয়েছে। হাসপাতাল অপেক্ষা প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রই বলা ভাল বোধহয়।

যাইহোক ঐ হাসপাতালে কয়েকজন আহত সৈনিক বা সাধারণ নাগরিকও রয়েছে দেখলুম। দৃশ্যটা করুণ। কেউ মৃত্যু যন্ত্রণায় চিৎকার করছে, কেউবা সদ্য মরেছে।

একটা বেডে দেখলুম একটা লাশ পড়ে রয়েছে। লাশটাকে নাড়তে আমার হাতে বেশ খানিকটা রক্ত লাগল। বুঝলুম লোকটা প্রচুর রক্তপাতের ফলে মরে গেছে, বেশিক্ষণ আগে তার মৃত্যু হয়নি।

ইতিমধ্যে অ্যানালিসা নার্সের মাথার একটা টুপি যোগাড় করে মাথায় পরে নিয়েছে। একটা অ্যাপ্রন যোগাড় করে সেটা কোমরে বাঁধছে।

হাসপাতালের কে একজন, বোধহয় ডাক্তারই হবে, বলল, রাশিয়ানরা যে কোনো মুহূর্তে এসে পড়তে পারে। শুনেই আমি লাশটাকে তুলে অন্য বেডে অন্য একটা লাশের পাশে ফেলে সেই রক্তভেজা বেডে শুয়ে গায়ের ওপর কম্বল টেনে দিলুম।

ডাক্তারের অনুমান ঠিক। আধ ঘণ্টার মধ্যেই রাশিয়ানরা রাইফেল

উঁচিয়ে হৈ হৈ করে হাসপাতালে ঢুকে পড়ল। আমি কাৎরাতে লাগলুম। অ্যানালিসা আমার বেডের পাশে দাঁড়িয়ে রইল, যেন আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে এসেছে।

আমি কাতরাচ্ছি, যেন যন্ত্রণায়। রুশ সৈনিকরা রাইফেল উঁচিয়ে এক বেড থেকে আর এক বেডে যাচ্ছে। কটাই বা বেড? কয়েকটা আহত মানুষ বা লাশ রাইফেলের নল দিয়ে খোঁচা মেরে কি দেখল কে জানে।

একজন আমার কাছে এসে কম্বলটায় টান দিল। কম্বলে রক্তের দাগ। আমায় ঠেলে দিতেই তার হাতে রক্ত লাগল। রুশ ভাষায় গজ গজ করে কি বলতে বলতে অন্যদিকে চলে গেল।

ইতিমধ্যে আর একটা রুশ রাইফেল নামিয়ে এক হাত দিয়ে অ্যানালিসার কোমর জড়িয়ে ধরেছে আর অপর হাত দিয়ে তার রিস্টওয়াচ, আংটি আর গলার সরু সোনার চেনটা টান মেরে খুলে নিয়ে পকেটে পুরল, তারপর থাবার মতো হাতে অ্যানালিসার বুক মুচড়ে দিয়ে গালে চকচক করে চুমো খেয়ে খানিকটা থুতু লাগিয়ে দিয়ে হ্যা হ্যা করে হাসতে হাসতে চলে গেল।

অ্যানালিসাব বোধহয় গা গুলিয়ে উঠছিল, সে তাড়াতাড়ি বাথরুমের দিকে গেল। রাগে আমার আপাদমস্তক কাঁপলেও কিছু করতেপারলুম না। এতগুলো রাইফেলের বিরুদ্ধে আমি একা কি কবব? তা আমার গায়ে যতই জোর থাক। সব হজম করতে হল।

হাসপাতালটা উলটে পালটে দেখে তারা চলে গেল।

দু'দিন পরে আমরা বারলিনের উপকণ্ঠে এসে ঠিক করলুম আমরা পায়ে হেঁটে ড্রেসডেন যাব। ওখানে তখন অ্যামেরিকানরা পৌঁছে গেছে। সেখানে একবার পৌঁছতে পারলে ভয় নেই।

অ্যানালিসা বৃদ্ধার মতো ছদ্মবেশ নিল; মাথায় একটা হুড লাগিয়ে চুলগুলো ঢাকল। মুখে কি সব রং লাগালো, দাঁতগুলো কালো করল। ঈষৎ কুঁজো হয়ে হাঁটতে লাগলু।

বারলিনের অবস্থা তখন শোচনীয়। যেন বিরাট ভূমিকম্প হয়ে গেছে। চারদিকে আগুন জ্বলছে, রাস্তায় এখানে সেখানে লাশ পড়ে আছে। যারা সক্ষম তারা ভাঙা বাড়ি খুঁড়ে কিছু জিনিসপত্তর উদ্ধার করবার চেষ্টা করছে। খাবারের জন্যেও অনেকে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

প্রত্যেক মোড়ে রাশিয়ান সৈনিকরা টমিগান উঁচিয়ে পাহারা দিচ্ছে। ট্যাংক আর আরমার্ড কার রাস্তায় টহল দিচ্ছে। বৃদ্ধ, অশক্ত পুরুষ, নারী বা শিশুদের জন্যে আহার দেওয়া তো দূরের কথা তখনও কোনো ত্রাণের ব্যবস্থা করেনি। অনেক সৈনিক লুঠপাট নিয়ে ব্যস্ত। অবশ্য যুদ্ধের সময় সৈনিকরা এমন করলে দোষ দেওয়া যায় না। এরাও একদা জার্মান সৈনিকদের হাতে চূড়ান্তভাবে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হয়েছে।

[প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা মনে আসছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমরা দেখেছি অ্যামেরিকান সৈনিকরা গ্রামাঞ্চলে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে পুকুরে বা নদীতে স্নান করত বা রাস্তায় ঘুরে বেড়াত। পথে কোনো আদিবাসী যুবতী পড়লে তার নিস্তার নেই। অথচ ব্রিটিশ সৈন্য যারা অশিক্ষিত ও টমি বলে পরিচিত তারা কর্তাদের আদেশ পেয়ে শহর গ্রাম তছনছ করে দিয়েছে কিন্তু তারা মার্কিন সৈন্যদের মতো অমন অশ্লীল ব্যবহার কখনও করেনি। অথচ মার্কিন সৈন্যরা সকলেই শিক্ষিত ছিল, টমিদের মতো আকাট মূর্খ নয়। টমিরা কঠোরভাবে ডিসিপ্লিন মানত।]

রাশিয়ানরা ঘোষণা করছে হিটলার মারা গেছে। তাদের কোনো কোনো দল রাস্তায় গান গেয়ে বেড়াচ্ছে। কোথা থেকে হঠাৎ একদল প্রায় বিবস্ত্র মেয়ে রাস্তায় ছুটে এল। দেখলুম দেহে ফ্রক থাকলেও তা খুবই ছিন্নভিন্ন, তাদের সুপুষ্ট দেহ পুরো ঢাকা পড়েনি। একটি যুবতীর দেহে একটি ছেঁড়া শার্ট ঝুলছে, তার ডান দিকের বুক উন্মুক্ত,

নিম্নাঙ্গও পুরো ঢাকা পড়েনি, প্রায় অনাবৃত। মেয়েগুলি নিজেদের অবস্থা ও পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে উদাসীন, কেমন যেন বিহ্বল। দু'তিন জন রুশ সৈন্য টলতে টলতে তাদের অন্য কোথাও নিয়ে যাচ্ছে। দুটো সৈন্যই প্রচুর মদ্যপান করেছে।

মেয়েগুলির অবস্থা দেখে বোঝাই যাচ্ছে যে কিছুক্ষণ আগেই তারা ধর্ষিতা হয়েছে এবং এই একই উদ্দেশ্যে তাদের অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাদের যখন ছেড়ে দেওয়া হবে তখন তাদের দেহে বোধহয় অবশিষ্ট বস্ত্রখণ্ডগুলিও থাকবে না। তাদের বোধহয় উলঙ্গ করে রাস্তায় বার করে দেবে। কি অসহায় অবস্থা!

যাইহোক কোনরকমে ক্ষুধার্ত বাঘের তুল্য রুশ সৈনিকদের দৃষ্টি এড়িয়ে আমরা দু'জনে এবং আরও কয়েকজন ড্রেসডেন যাবার মেনরোডের ওপর পড়লুম। এই রাস্তায় উঠে দেখলুম দলে দলে নারীপুরুষ, বালক-বালিকা শরণার্থীর দল চলেছে। যে যা পেরেছে কিছু জিনিস সঙ্গে নিয়েছে, কারো পিঠে, কারো মাথায় বা কারো কাঁধ থেকে নানা আকারের পুঁটুলি ঝুলছে। কেউ কেউ বাচ্চাদের ঠেলাগাড়ি করে বা সাইকেলে করেও মালপত্তর নিয়ে চলেছে।

দূরে যেই ট্রাক বা ট্যাংকের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে অর্থাৎ টহল-দারী রুশ সৈন্য আসছে, আমরা সকলেই রাস্তা ছেড়ে মাঠে নেমে ঝোপঝাড় বা গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ছি।

সেদিন সারাদিনই আমরা হাঁটলুম। মাঝে মাঝে কিছু বিশ্রাম নিতে হচ্ছিল।

ক্রমে অন্ধকার নামল। রাস্তায় আলোর কোনো প্রশ্ন ওঠে না। হঠাৎ কোথা থেকে তিনটে রুশ সৈন্য এসে হাজির। আমরা তো চমকে উঠেছিলুম। অ্যানালিসা তো ভয়ে আমার পিছনে চলে গেল।

একটা সৈন্য আমার কাছে দেশলাই চাইল। আমি দিলুম। সে দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরিয়ে জ্বলন্ত দেশলাই কাঠিটা অ্যানালিসার

মুখের সামনে তুলে ধরেই চিনতে পারল, এ তো বুড়ি নয়। কাঠিটা ফেলে দিয়ে ঠোঁটে সিগারেটটা চেপে ধরে জোর করে অ্যানালিসার মাথার হুডটা খুলে দিয়ে মুঠি করে তার চুল টেনে মুখটা তুলে ধরে রুশ ভাষায় সঙ্গীদের কি বলতেই আর একজন ছুটে এসে এর সঙ্গে যোগ দিয়ে দু'জনে মিলে অ্যানালিসাকে তুলে কাছেই একটা কুটিরে নিয়ে গেল, এরা বোধহয় এই কুটিরেই ছিল।

তৃতীয় রুশটা আমার হাতে এক প্যাকেট সিগারেট গুঁজে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ফ্রাউ? তোমার বৌ? তারপর রুশ ভাষায় যা বলল তা আমি না বুঝলেও আমার মনে হল ব্যাটা বলছে, তুমি সিগারেটগুলো একে একে টান আমরা ততক্ষণে তোমার বৌকে নিয়ে একটু খেলা করি।

সত্যি বলতে কি ঘটনার আকস্মিকতায় আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলুম। কুটিরের ভেতর থেকে অ্যানালিসার আর্তনাদ ভেসে এল, না না আমাকে ছেড়ে দাও, উঃ ছেড়ে দাও, উঃ দয়া করে ছেড়ে দাও, উঃ এই কি করছ।

আমি আর থাকতে পারলুম না। কুটিরের ভেতরে ঢুকে পড়লুম। ভেতরে কেরোসিনের একটা আলো জ্বলছিল। সেই আলোয় দেখলুম, ওরা খড়ের গাদার ওপর অ্যানাকে শুইয়েছে, একজন অ্যানার কাঁধদুটো টিপে ধরেছে, আর একজন অ্যানার ইজেরটা টেনে ছিঁড়ে দিয়েছে, অ্যানা প্রায় নগ্ন।

তৃতীয় রুশটা যে আমাকে সিগারেট দিয়েছিল সে আমাকে দেখতে পেয়ে আমাকে আক্রমণ করতে এল কিন্তু আমি এত জোরে তার থুতনির নিচে একটা ঘুঁসি মারলুম যে তার হাড় ভেঙে গেল। লোকটা ছিটকে পড়ল, বোধহয় মরেই গেল।

যে লোকটা অ্যানার ইজের ছিঁড়ে দিয়েছিল, আমি আমার সর্বশক্তি নিয়োগ করে তার পিছনে এত জোরে সবুটলাথি মারলুম যে সে তার সামনের সঙ্গীর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। হাতুড়ির মতো একটা কিছু

পড়েছিল, আমি সেটা তুলে নিয়ে দুটোর মাথায় এলোপাথাড়ি মারতে লাগলুম যে পর্যন্ত না মরে গেল। প্রথমটাকে পা দিয়ে ঠেলে দেখলুম মরে গেছে। মড়ার ওপর আর হাতুড়ির ঘা দিলুম না।

ধাক্কাধাক্কিতে বেচারী অ্যানালিসা যথেষ্ট আঘাত পেয়েছিল। রুশ দুটো ওকে কিল ও চড় মেরেছিল। বুকে ও উরুতে কালসিটে পড়ে গেছে, উঠতে পারছে না, যন্ত্রণায় কাতর ধ্বনি করছে।

এই কুটিরে বোধহয় আর থাকা নিরাপদ নয়। আমি তাকে তুলে নিয়ে কুটিরের বাইরে এনে একটা গাছের আড়ালে ঘাসে শুইয়ে রাখলুম। তারপর কুটিরে ফিরে যেয়ে লাশ তিনটে কুটিরের কোণে খড় দিয়ে ঢেকে দিলুম। যতক্ষণ না পচে গন্ধ বেরোবে ততক্ষণ কেউ দেখতে পাবে না।

অ্যানালিসার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেল। সে সাংঘাতিক মানসিক আঘাত পেয়েছে আর এইজন্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। শরীরে শক্তি নেই। চলতেও পারছে না।

আমি তাকে আমার কাঁধে তুলে নিলুম। ভাগ্য ভালো যে কিছুদূর হাঁটতেই এক জার্মান কৃষক দম্পতির কুটির পাওয়া গেল। তাদের সব বলতে তারা অ্যানার যথেষ্ট পরিচর্যা করল। তাকে কিছু খেতে দিল। একটা শিশি বার করল। শিশিতে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি ছিল। কৃষক বলল, এই ব্র্যাণ্ডিটুকু তারা অনেক কষ্টে যোগাড় করেছিল, নেহাত দরকার না হলে খায় না। তাই থেকে একটু অ্যানাকে খাইয়ে দিল। কৃষক পত্নী তাকে সেঁকতাপ দিয়ে নিজের কিছু পরিচ্ছদ পরিয়ে দিল। তাদের অনেক ধন্যবাদ দিয়ে আমরা দু'জনে বিদায় নিলুম।

সারাদিন হাঁটার ফলে অ্যানা তো ক্লান্ত হয়েছিলই তারপর ঐ ঘটনার পর ও ভীষণ নারভাস হয়ে পড়েছে। পুনরায় আক্রমণ আশঙ্কা করছে। তাকে মাঝে মাঝে কাঁধে তুলে নিতে হচ্ছে। আমি নিজেও যথেষ্ট ক্লান্ত। তবুও চলতে হবে।

চলতে চলতে একসময়ে আমরা এলব্ নদীর ধারে এসে পৌঁছলুম। পার হবার উপায় নেই। সমস্ত ব্রিজ আমেরিকান বা রুশ মিলিটারির দখলে। কোন মানুষকে ওরা ব্রিজের কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না।

আমরা পার হবার উপায় খুঁজছি। একটা ডিঙি বোটও দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ কয়েকজন জার্মানের সঙ্গে দেখা হল। তারা কাঠের গুঁড়ি দিয়ে ভেলা বানাচ্ছে। আমি ওদের সাহায্যে এগিয়ে এলুম। অ্যানাও কিছু কিছু দড়ি বা ছুরি বা অন্য কিছু এগিয়ে দিতে লাগল।

ভেলা তৈরি হল। দিনের আলোয় পার হওয়া যাবে না অতএব অন্ধকার নামা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল। তারপর অন্ধকার নামার পর অতি সাবধানে আমরা নদী পার হলুম।

ওপারে পৌঁছে দেখি অ্যামেরিকানরা বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের জন্যে ক্যাম্প খুলেছে। সেখানে আমরা আশ্রয় পেলুম। উত্তম ব্যবস্থা। ওরা অ্যানালিসার চিকিৎসা করে মেয়েদের ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিল। আপাতত নিশ্চিন্ত।

আমি আমার নাম বললুম হ্যান্স স্যানডাউ, আমরা সুইটজারল্যাণ্ডের অধিবাসী। আমি এক সার্কাস পার্টির স্ট্রংম্যান, আমার অতুল শক্তির পরিচয় দেবার জন্যে নানারকম খেলা দেখাই। ভারি ওজন তুলি, বুকে পেটে ও কাঁধে লোহার ভারি ভারি বল ফেলতে বলি, গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলে পড়ি, দর্শকরা পা ধরে টানে কিন্তু মরি না। আমি সমস্ত পেশী নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। আরও অন্যরকম খেলা দেখাই, লম্বা বেঞ্চির একদিক শুধু দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে তুলে ফেলি, লোহার মোটা রড অবলীলায় পেঁচিয়ে স্প্রিং বানিয়ে দিই, এক প্যাকেট তাস একসঙ্গে ছিঁড়ে ফেলি, মোটর গাড়ি আটকাই। এছাড়া কুস্তি আর বকসিং লড়তে পারি। আমার বৌ অ্যানালিসা ট্র্যাপিজের খেলা জানে, তারের ওপর দিয়ে হাঁটতে পারে, নাচতে পারে।

অ্যানালিসা কয়েকদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠল। ভালো আহার ও পরিচর্যার ফলে সে তার স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছে। এবার

অন্যান্য বিবাহিতদের মতো একত্রে থাকবার জন্যে আমাদের আলাদা একটা ঘর দেওয়া হল। অ্যামেরিকানরা রাতারাতি অনেক কাঠের বাড়ি বানিয়ে ফেলেছে।

বাড়িগুলির বিভিন্ন অংশ কেটেকুটে রেডি করে জাহাজে করে দেশ থেকে নিয়ে এসেছিল, এখানে ফিট করেছে।

দু'জনে বেশ মজায় দিন কাটাতে লাগলুম কিন্তু একটা ভয় মন থেকে তাড়াতে পারছি না। যুদ্ধ চলার সময় কিছু স্যাবোটাজ, কিছু গুপ্তচরগিরি করেছি। নিরপেক্ষ দেশের নাগরিক বলে পরিচয় দিলেও বিপদ এড়ানো যাবে না। মিত্রশক্তি ও রাশিয়ান, জার্মান বা অ্যামেরিকানরা কেউই আমাকে সহসা মেরে ফেলতে পারবে না কারণ আমি আমার বিষয় অনেকটাই সত্য বলেছিলুম। কিছু মিথ্যা বলেছি, সে তো আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্যে। ওদের তো আমি ভাল করে চিনি না।

কয়েকদিনের মধ্যে আমাদের ক্যাম্পে বা বন্দীনিবাসে মোটামুটি একটা নিয়মশৃঙ্খলা চালু হল। ক্যাম্পে কয়েকজন এমন জার্মান বন্দী ছিল যারা কিছু গান বাজনা জানত বা ক্রিয়াকৌশল দেখাতে পারত, কেউ কেউ কমিক দেখাতেও পারত।

আমরা তখন অন্য বন্দীদের ও অ্যামেরিকানদের চিত্ত বিনোদনের জন্যে দল বেঁধে ভ্যারাইটি প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করলুম। তাদের নাচ, গান, খেলা, বকসিং ম্যাচ ইত্যাদি দেখাই। জীবনের একঘেয়েমি কাটে, বন্দীরা সাময়িকভাবে হলেও দুঃখকষ্ট ভোলে।

কয়েকদিন বেশ কাটল, তারপর অনেকেই ক্যাম্প ছেড়ে ভয়ে পালাল। আমি আর অ্যানালিসা ঠিক করলুম আমরা এখানেই থাকব।

একটা খালি কটেজ পাওয়া গেল। অন্য খালি কটেজ থেকে আসবাব ও দরকারী কিছু সামগ্রী সংগ্রহ করে কটেজে গুছিয়ে বসলুম।

বেশ কিছুদিন দারুণ কষ্টের পর আমরা নিরাপদে ও আরামে বাস করতে লাগলুম।

অ্যামেরিকানরা বেশ মজার লোক। তারা অনেকেই একে একে দেশে ফিরবে, তাদের জায়গায় নতুন দল আসবে। যারা দেশে ফিরবে তারা যাবার আগে এদেশের কিছু স্মৃতিচিহ্ন বা সুভেনির নিয়ে যেতে চায়।

একটা খালি কটেজে কয়েকডজন হিটলারের 'মাইন ক্যাম্ফ্' অর্থাৎ 'আমার সংগ্রাম' বইখানা ছিল। আমার একজন জার্মান বন্দী বন্ধু বই-গুলোতে হিটলার ও গোয়বেলসের জাল সই করে দিতে লাগল। আমি সেই বইগুলোকে অ্যামেরিকানদের কাছে চড়াদামে বিক্রি করলুম। কেউ কেউ ৫০ ডলার পর্যন্ত দাম দিল একখণ্ড মাইন ক্যাম্ফের জন্য।

বই ছাড়া জার্মানদের ফেলে যাওয়া পিস্তল, তলোয়ার, পোশাক মেডেল এবং আরো কিছু টুকিটাকি সংগ্রহ করেছিলুম। এগুলো প্রত্যেকটা ১০ ডলার দামে বেচে দিলুম। অ্যামেরিকানরা যখন ড্রেসডেন ছেড়ে গেল তখন আমার থলেতে তিন হাজার ডলার জমা পড়েছে। এছাড়া অনেক সিগারেট ও টিনভর্তি নানারকম খাবার, চিজ, মাখন, ড্রাইফ্রুট ইত্যাদি সংগ্রহ করলুম।

আমাদের জীবনে একটা ছিরিছাঁদ ফিরে এল। আমরা দু'জন মোটা-মুটি আরামে জীবন কাটাতে লাগলুম। আমি যেসব খেলা জানতুম সেগুলো দেখাতে আরম্ভ করলুম যেমন ওয়েট লিফটিং, কুস্তি, জিমন্যাস্টিক।

আমার কয়েকটা প্রিয় খেলা ছিল যেমন পেটের ওপর ৫৬ পাউণ্ড ওজনের নিরেট লোহার বল ফেলে দেওয়া। আগে একটা কামান থেকে বল ছোঁড়া হত আর আমি আমার পেট দিয়ে বলের আঘাত প্রতিহত করতুম। এখানে তো কামান ছিল না তাই আমি মাটিতে শুয়ে পড়তুম আর একজন একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে বলটা আমার পেটের ওপর ফেলে দিত। বল যোগাড় হয়েছিল, তার ওজনও প্রায় ৫৬ পাউণ্ড।

আমার আর একটা খেলা ছিল। গলায় ফাঁস লাগিয়ে ফাঁসি যাওয়ার মতো ঝুলে পড়তুম। দর্শকদের বলতুম আমার পা ধরে টানতে। আমি আমার গলার ও ঘাড়ের পেশীগুলো সেইরকম মজবুত করে তৈরি করেছিলুম। পেশীগুলো অনেকক্ষণ পর্যন্ত ফুলিয়ে ও শক্ত করে ধরে রাখতে পারতুম। আমার পা ধরে কেউ সহসা ঝাঁকুনি দিয়েও আমার কিছু করতে পারত না।

এই খেলা খেলবার সময় একদিন লক্ষ্য করছিলুম একটি কিশোরী হাত দিয়ে তার চোখ চাপা দিয়েছে। সে হয়তো ভেবেছে আমি এবার মরেই যাব। চোখের সামনে একটা জলজ্যান্ত মানুষের মৃত্যু সে সহ্য করবে কি করে।

আমার আর একটা খেলা সকলে উপভোগ করত যদিও খেলাটা বেশ সহজ। আমি দুই কাঁধে ও দুই হাতে দু'জন করে চারজন টাইট পরিহিতা তরুণীকে দাঁড় করিয়ে দিতুম। এই চারজনকে আমি অবলীলায় ধরে রাখতুম। মেয়েগুলি সার্কাসের মেয়ে ছিল না, তাদের অভ্যাস করাতে হয়েছিল। চারজনের মধ্যে একজন অবশ্য অ্যানালিসা থাকত। সে আমার কাঁধে উঠে বাকি তিনটে মেয়েকে ব্যালান্স করতে শিখিয়ে দিয়েছিল।

অ্যানালিসার জন্যে সার্কাসের মেয়েদের মতো একটা সাদা টাইট যোগাড় হয়েছিল। আগে যখন সার্কাসে খেলা দেখাতুম তখন অ্যানালিসা কালো বা লাল টাইট পরত কিন্তু এখানে রঙিন টাইট কোথায় পাব? তাই সাদা টাইট পরেই অ্যানালিসা কাজ চালাত। কিন্তু সাদা টাইট তার ফর্সা রঙের সঙ্গে মিশে যেত তাই কিছুদূর থেকে তাকে দেখলে মনে হত সে বুঝি নগ্ন হয়ে আছে। অ্যানালিসাও কিছু খেলা দেখাত। তার খেলা দারুণ জমত।

আর যোগাড় হল মাল তোলবার একটা ক্রেন। আমি মাটিতে শুয়ে পড়তুম। অ্যানালিসা বলটা ক্রেনের ডগে লাগিয়ে দিত আর

আমি ইশারা করলে প্রায় কুড়ি ফুট উঁচু থেকে বলটা সে ছেড়ে দিত। কোনো কোনো দর্শক বলটা তুলে দেখত সেটা সত্যিই লোহার না ফাঁপা।

লোহার বলটা যে নিরেট এবং বেশ ভারী তা দর্শকদের সামনে প্রমাণ করবার জন্যে আমি একদিন বলটাকে একটা কাঠের টেবিলের ওপরে ফেলতে বললুম। বল ফেলার পর টেবিলটা ফেটে গেল। এবার দর্শকরা সত্যিই বিস্মিত হল।

খেলা দেখাবার সময় মাঝে মাঝে অবাঞ্ছিত ঘটনাও ঘটত। একদিন আমি একটু দূরে ছিলুম। অ্যানালিসা তার সাদা টাইট পরে কিছু খেলা দেখাচ্ছিল। সহসা একজন যুবক দর্শক এসে অ্যানাকে সবলে জড়িয়ে ধরল। অ্যানা নিজেকে মুক্ত করবার কিছু কিছু কৌশল জানত কিন্তু যুবক বেশ বলশালী এবং এত জোরে অ্যানাকে চেপে ধরেছিল যে সে নিজেকে ছাড়াতে পারছিল না। যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ার ফলেই বোধ-হয় দর্শকদের শালীনতাবোধ একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তাই তারা যুবককে বাধা দেওয়া বা অ্যানাকে মুক্ত করবার চেষ্টা না করে দৃশ্যটা উপভোগ করতে লাগল।

যুবক অ্যানার দেহ থেকে টাইটটা টেনে খুলে ফেলবার চেষ্টা করছিল। অ্যানা চিৎকার করে উঠল। আমি ছুটে আসতে আসতে যুবক অ্যানার উর্ধাঙ্গ থেকে টাইটটা খুলে ফেলেছিল। আমি অ্যানার কাছে যেতেই যুবক অ্যানাকে ছেড়ে দিয়ে আমাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হল। তার চোখ লাল, নাক ফুলে উঠেছে, উত্তেজনায় কাঁপছে কিন্তু সে আমার শক্তির পরিচয় জানে না। সে আমাকে আঘাত করবার পূর্বেই আমি চকিতে তাকে দু'হাতে আমার মাথার ওপর তুলে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলুম। তারপর দর্শকদের উদ্দেশ করে বললুম, কি দেখছিলে? লজ্জা করে না? ভাবছিলে ছোকরা বুঝি আমার বৌকে মাটিতে ফেলে মজা করবে আর তোমরা মজা করে দেখবে? এই যে দেখ আমি এই তোমার বৌকে ধরলুম।

আমি সত্যিই একটি যুবতীর ডানবাহু ধরে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে বললুম, এই যে দেখ, কেমন লাগছে ?

যুবতীর স্বামী হাঁ হাঁ করে উঠে যুবতীর অপর হাত ধরে টেনে সরিয়ে নিয়ে গেল। এবার সকলে বুঝল তারা অন্যায় করেছে। যুবককে উৎসাহ দেওয়া উচিত হয়নি, বাধা দেওয়া উচিত ছিল।

রাশিয়ানরা ক্যাম্পের ভার নেওয়ার পর আমরা পুরোপুরি একটা সার্কাসের দল খুলে ফেললুম। দলে সার্কাসের প্রধান আকর্ষণগুলি ছিল না, যেমন ট্র্যাপিজ, জীবজন্তু বা তারের ওপর সাইকেল চালানো ইত্যাদি। তবুও যা আছে তাই দিয়েই আমরা ক্যাম্পের সকলকে যথেষ্ট আনন্দ দিতে পারতুম।

সার্কাস পার্টি খোলবার জন্যে রুশ কর্তাদের অনুমতি পাওয়া গেল। আমরা আরও একটা অনুমতি পেলুম। সার্কাসের এই দল নিয়ে আমরা অন্য ক্যাম্পেও যেতে পারব। ওরা আমাদের যাতায়াতের জন্যে মোটর যান দেবে তবে সঙ্গে রক্ষীও থাকবে।

আমাদের দল ক্রমশ বড় হতে লাগল। তারের খেলা দেখাবার জন্যে তার পাওয়া গেল, সাইকেলের একজন খেলোয়াড় পাওয়া গেল, একটা কুকুর পাওয়া গেল, কুকুরটা খেলা দেখাত, মেয়েও কয়েকজন পাওয়া গেল, তারাও অনেক রকম খেলা দেখাত। মিলিটারি ব্যাণ্ড পার্টিও খেলা দেখাবার সময় ব্যাণ্ড বাজাত। একেবারে জমজমাট সার্কাস পার্টি। একটা নামও দেওয়া হল, লিংকার্স সার্কাস।

আমি যখন লোহার বলের খেলা দেখাতুম তখন দলের একজন ক্লাউন রুশ ও জার্মান ভাষায় ঘোষণা করত, যে আমার মতো পেটে লোহার বল নিতে পারবে তাকে ২০০ মার্ক পুরস্কার দেওয়া হবে। চ্যালেঞ্জ।

একদিন একজন রুশ দর্শক আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করল। বিরাট চেহারা, চওড়া কাঁধ, চওড়া ছাতি। দেখলেই বোঝা যায় ব্যায়ামপুষ্ট

দেহ, গায়ে শক্তিও আছে অফুরন্ত, একটা মানুষকে শুধু টিপে তার হাড়গোড় চূর্ণ করে ফেলতে পারে।

সে আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে পোশাক-পরিচ্ছদ সব খুলে একটা বাইক পরে নিল, তারপর যে ক্রেন থেকে লোহার বলটা ফেলা হবে তার নীচে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। শুয়ে বলল, দেখো যেন বলটা আমার মুখ বা মাথার ওপর বা তলপেটের নীচে না পড়ে, এছাড়া যেখানে ইচ্ছে বল ফেলতে পার।

অ্যানালিসা তার সাদা টাইট পরে ক্রেনের ডগে উঠে গেল, আমি কোনো সাহায্যের জন্যে তার পাশে দাঁড়িয়ে রইলুম, ব্যাণ্ড বাজতে লাগল। সে ইশারা করতেই অ্যানালিসা বলটা ঠিক তার পেটের ওপর ফেলল। লোকটা একটু অস্ফুট আওয়াজ করল, এই পর্যন্ত, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে সার্কাসের খেলোয়াড়দের মতো দর্শকদের অভিবাদন করল।

আমরা শর্ত অনুসারে তাকে ২০০ মার্ক দিলুম কিন্তু ও আবার সেই ২০০ মার্ক থেকে ১০০ মার্ক অ্যানাকে উপহার দিল। তারপর সে বলল, যদি একটা কাঠের পিপে যোগাড় করতে পারো তো আমি একটা খেলা দেখাতে পারি। কাঠের পিপে পাওয়া গেল না তবে লোহার একটা ছোট ড্রাম পাওয়া গেল, ও বলল এতেই হবে।

তারপর সে দু'পায়ে ছোট কয়েকটা ঘণ্টা বেঁধে চিৎ হয়ে শুয়ে দু'পা দিয়ে ড্রামটাকে লুফে লুফে নাচাতে লাগল। দর্শকরা খুব মজা উপভোগ করতে লাগল। ব্যাণ্ড পার্টিও তালে তালে ব্যাণ্ড বাজাতে লাগল।

তাকে আমার দলে আসতে বলেছিলুম কিন্তু তার ব্যাটালিয়ন পর-দিনই অন্যত্র বদলি হয়ে যাচ্ছে নচেৎ সে দলে আসত। তবে বলল, আমি যেখানে থাকব সেদিকে যদি তোমরা যাও তো কয়েকটা খেলা দেখাতে পারি।

আমরা লিংকার্স সার্কাসের দল নিয়ে ইস্ট জার্মানির নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ালুম। এই সুযোগে আমি কয়েকজন লোককে ইস্ট জার্মানি

থেকে ওয়েস্ট জার্মানি বা অন্যত্র পালাতে সাহায্য করেছিলুম। বেশির ভাগ ছিল বৃদ্ধ, নারী ও শিশু।

আমাদের সার্কাস দলের মালিকের নাম ছিল লিংকার। তারই নাম অনুসারে লিংকার্স সার্কাস নামকরণ করা হয়েছিল। আমি যে সীমান্ত দিয়ে লোক পাচার করি সেটা লিংকার জানত। লিংকার আমাকে একদিন সাবধান করেছিল, যা করেছ তা করেছ, আর লোক পাচার করবার চেষ্টা কোরো না, রুশ গুপ্তচর সংস্থা এন কে ভি ডি সন্দেহ করছে যে দলের কেউ লোক পাচার করে। সে বলেও ছিল কয়েক দিন থেকে এন কে ভি ডি-র লোকেরা ছদ্মবেশে আমাদের দলের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

একদিন রাত্রে আমি আর অ্যানালিসা আমাদের ঘরে ঘুমোচ্ছি এমন সময় দরজায় দুমদাম ধাক্কা। আমি উঠে দরজা খুলে দিতেই ঘরের মধ্যে টমিগান হাতে দু'তিনজন রুশ পুলিস ঢুকে পড়ল, বাইরেও বোধ হয় দু'তিনজন পুলিস দাঁড়িয়েছিল।

একজন জিজ্ঞাসা করল, তোমার নাম তো হ্যান্স স্যানডাউ?

অস্বীকার করে উপায় নেই। তারা বলল, দু'জনেই জামা কাপড় পরে তৈরি হয়ে নাও।

অ্যানা গায়ে চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়েছিল। আমি ওদের অনুরোধ করলুম, তোমরা তাহলে বাইরে একটু অপেক্ষা কর নইলে আমার স্ত্রী বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে না।

একজন তার টমিগান নেড়ে হো হো করে হেসে উঠল তারপর টান মেরে অ্যানার চাদরটা খুলে দিল। আর সকলে হো হো করে হেসে উঠল।

অ্যানার দেহে স্বল্পবাস ছিল। যাইহোক সে বিরক্তি প্রকাশ করে উঠে দাঁড়াল। আমরা দু'জন জামাকাপড় পরতে লাগলুম। কানে বিদ্রূপ ও অশ্লীল মন্তব্য ধাক্কা মারতে লাগল।

ইতিমধ্যে দু'জন আমাদের ঘর সার্চ করতে আরম্ভ করেছে। আপত্তি-কর কিছু পায় নি তবে আমাদের টাকা পয়সা আর সিগারেটের প্যাকেটগুলো ঝোলায় পুরলো।

আমরা শুধু চেয়ে দেখলুম। আমাদের জামাকাপড় পরা হয়ে গিয়েছিল। ওরা আমাদের দু'জনেরই হাতে হাতকড়া লাগিয়ে দিল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে আমি ঠিক এক বছর মুক্ত ছিলুম। এবার রুশেদের হাতে বন্দী।

ট্রাকে চাপিয়ে ওরা আমাদের হ্যালে জেলখানায় নিয়ে তুলল। ট্রাকে আসতে আসতে আমরা দু'জনে ঠিক করেছিলুম যে বার্লিন টানেলে যে তিনটে রুশ অ্যানাকে ধর্ষণ করবার চেষ্টা করেছিল তাদের আমি খুন করেছি আর পরে আমি কিছু মানুষ সামান্ত পার করে দিয়েছি, এই সব কথা আমরা কখনই বলব না।

হ্যালে জেলখানায় আসবার পর ওরা অ্যানালিসাকে অন্যত্র নিয়ে গেল। বিদায় নেবার আগে আমরা চুম্বন করতে যাচ্ছিলুম কিন্তু ভাল করে ঠোঁট স্পর্শ করার আগেই ওরা অ্যানালিসাকে টেনে নিয়ে গেল। অ্যানার চোখে জল এসে গেল। চোখের জল মোছবার উপায় নেই, হাতে হাতকড়া।

অ্যানালিসাকে সাহস দেবার জন্যে বললুম, ঘাবড়িও না ডার্লিং, সব ঠিক হয়ে যাবে, আমরা আবার মিলিত হব।

জেলখানায় একটা ঘরে ওরা আমাকে নিয়ে গিয়ে উলঙ্গ করে আমার জামা কাপড় সার্চ করল। তারপর আমাকে অন্য একটা প্যান্ট আর শার্ট পরতে দিল। ভেবেছিলুম জেরা করবে, দু'চারটে কিল, চড় বা ঘুঁসি মারবে কিন্তু তারা কিছুই করল না। আমাকে ওরা একটা সেলে পুরে লোহার ফটক বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিল। সেলে আমি একা।

এক মাস পরে আমাকে সেল থেকে বার করে নিয়ে এল। বাইরে

রোদ উঠেছে, চোখ ধাঁধিয়ে গেল, কতদিন প্রায় অন্ধকারে ছিলুম।

একটা ঘরে আমাকে নিয়ে যেয়ে একটা টেবিলের সামনে টুলে বসতে দেওয়া হল। টেবিলের ওধারে তিনজন রুশ অফিসার ছিল। ওরা তখন পরস্পর কথা বলছিল। কণ্ঠস্বর শুনে ও ভাবভঙ্গি দেখে তো মনে হল এরা ভদ্র।

একজন জিজ্ঞাসা করল, তোমার নাম হ্যান্স স্যানডাউ? সত্যি কথা বলবে।

সত্যি কথাই বললুম। জন্ম থেকে এক মাস আগে গ্রেপ্তার হওয়া পর্যন্ত আমার জীবনের সমস্ত কাহিনীই বললুম অবশ্য হত্যাকাণ্ডগুলি বাদে।

লোকগুলি সত্যিই ভদ্র। আমাকে কফি ও সিগারেট দিল।

আমি যা বললুম সবই ওরা খাতায় নোট করে নিল তবে সেইদিনই জেরা শেষ হল না। এক সপ্তাহ ধরে জেরা চলল।

এক সপ্তাহ পরে একজন আমাকে বলল, এবার বল তুমি ব্রিটিশদের হয়ে কি রকম গুপ্তচরবৃত্তি করেছিলে, ওদের কি কি গুপ্তখবর সরবরাহ করেছিলে।

এই প্রশ্ন শুনে আমি হতাশ হলুম কারণ আমি সত্যিই ব্রিটিশ স্পাই ছিলুম না। আমি বললুম, দেখুন আমি এযাবৎ যা বলেছি সবই সত্যি কথা বলেছি এবং সত্যি কথাই বলব, আপনারা বিশ্বাস না করলে আমি নাচার, আমি কোনদিনই ব্রিটিশের হয়ে গুপ্তচরগিরি করিনি, বলতে কি ইংলণ্ডের সঙ্গে আমার সাত বছর কোন যোগাযোগ নেই। ওরা আমার কথা বিশ্বাস করল না। অনেক জেরা করল; আমাকে যখন টলাতে পারল না তখন ওদের মুখোস খুলে গেল।

ওরা কাউকে ইসারা করল। প্রথমে মাথায় একটা আঘাত, তারপর পাঁজরে সবুট লাথি।

এবার আর আমাকে পুরনো সেলে নিয়ে যাওয়া হল না।

গার্ডরা এসে আমাকে মাটির নিচে একটা ঘরে নিয়ে চলল। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে লাগলুম। গুণে গুণে দেখলুম কুড়িটা ধাপ। নিচে একটা গার্ডরুম আছে। এখানে আমাকে একদফা উলঙ্গ করে সার্চ করা হল। আমাকে অন্য জামা প্যাণ্ট পরতে দেওয়া হল। ওরা আমার বেল্ট আর জুতোর লেস নিয়ে নিল আর সেই সঙ্গে আমার অন্য জিনিস।

আমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করে লম্বা করিডরে নিয়ে চলল। করিডর সাতফুট উঁচু আর চওড়া হবে পাঁচফুট। করিডরের দু'ধারে সারি সারি খুপরি, মানে সেল। বেশ জোর আলো জ্বলছে।

গার্ডরা আমাকে নিয়ে চলল। জুতোর শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। গার্ডরা থামল, আমিও থামলুম। একজন গার্ড চাবি বার করে একটা সেলের সবুজ রঙের দরজার তালা খুলল, তারপর দরজা। দরজা খোলার কোনো আওয়াজ হল না।

আমি তখনও জানি না যে এই সেলের মধ্যে আমাকে দু'বছর থাকতে হবে। আমাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। সেলটা সাড়ে পাঁচ ফুট স্কোয়ার। একটা চওড়া বেঞ্চ আছে, কম্বল বা বালিশ নেই, ঘরে জানালাও নেই। মাথার ওপর কমজোরী একটা বালব জ্বলছে।

আমাকে ঘরের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে ওরা তালা লাগিয়ে চলে গেল। সাড়ে পাঁচ ফুট ঘরে পাঁচ ফুট বেঞ্চে আমি পা ছড়িয়ে শুতে পারব না। পা মুড়েই শুতে হবে। চারদিক বন্ধ হলেও সেলের মধ্যে হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা আছে। আমার মনে হল ওরা আমাকে জ্যান্ত কবর দিয়ে গেল। প্রাকৃতিক ক্রিয়া সারবার জন্যে এক কোণে একটা পাত্র আছে আর এক কোণে জল ভর্তি একটা বড় মগ আছে। বুঝলুম রুশ গুপ্তচর বাহিনী ও জি পি ইউ বা ওগপু এইভাবে মানুষের মন ভেঙে দেয়।

বেঞ্চিতে চিৎ হয়ে শুয়ে মাথার নিচে হাত দুটো রেখে পা ছড়িয়ে দিতে দেওয়ালে পা ঠেকল কিন্তু দেওয়ালটা বেশ নরম মনে হল। কি ব্যাপার? উঠে বসে দেওয়ালে হাত বুলিয়ে দেখলুম দেওয়ালে বেশ

মজবুত করে গদি সাঁটা রয়েছে।

দেওয়ালে গদি অথচ আমাদের শুকনো কাঠের বেঞ্চিতে একটা কম্বল বা বালিশ দেওয়া হয়নি। কারণটা কি? কারণ বার করতে বেশ কিছুক্ষণ মাথা ঘামাতে হল। এইরকম সেলে থাকতে থাকতে বন্দীর যখন মাথা খারাপ হয়, মনোবল একেবারে ভেঙে যায় তখন যদি কেউ দেওয়ালে মাথা ঠুকে আত্মহত্যা করে সেইজন্যে এই ব্যবস্থা। বুঝলুম গদি হালে লাগানো হয়েছে। জার্মানদের আমলে এসব ছিল না, রুশরাই বসিয়েছে।

চুপ করে শুয়ে বা বসে থাকা ছাড়া সময় কাটাবার কোন উপায় নেই, পড়বার কিছুই দেওয়া হয় না। কখন সূর্য ওঠে, ডোবে, সকাল বা সন্ধ্যা হয় কিছুই বুঝতে পারি না। সময়েরও হিসেব নেই, দিনেরও হিসেব নেই।

কাঠের পাত্রে দু'বার করে ব্ল্যাক কফি আর দু'বার করে স্যুপ ও রুটি দিয়ে যেত। যে কফি রুটি নিয়ে আসত তার সঙ্গে টমিগান হাতে নিয়ে একজন গার্ড আসত। লোকটা টমিগান উঁচিয়েই থাকত। লোকগুলো মেসিন, মানুষ নয়, কথা বলা দূরের কথা, একটাও শব্দ পর্যন্ত করে না।

ওদের ব্ল্যাক কফি দিতে আসা অনুসারে আমি সময়ের ও দিনের একটা হিসেব রাখবার চেষ্টা করতুম, তাও গোলমাল হয়ে যেত। বোধহয় সাত আট দিন কেটেছে। আবার ক্ষিধে তেষ্টা বেশ কমে গেল। খেতে ইচ্ছে করে না। আমার শরীর যেন শুকিয়ে আসছে। কব্জি টিপে মনে হয় নাড়ী ক্ষীণ হয়ে গেছে। মগজ আর মন যেন আলাদা হয়ে গেছে। আমি আর আমার মধ্যে নেই।

একঘেয়ে বিস্বাদ কফি ও স্যুপ আর খটখটে শুকনো শক্ত রুটি দেখলে আমার বমি পেত। খাওয়া বন্ধ করে দিলুম। কতদিন খাই নি জানি না, বোধহয় দশ দিন হবে।

একদিন শাদা কোট পরা তিনজন লোক এসে জোর করে আমাকে চিকেনের গরম সুরুয়া খাইয়ে দিল। খারাপ লাগল না। একজন বলল আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ গুরুতর নয়। আমাকে শিগগির এখান থেকে বার করে নিয়ে গিয়ে আর এক দফা জেরা করা হবে তারপর আমাকে মার্কিন মিলিটারি পুলিসের হাতে দেওয়া হবে। মার্কিনরা যা ইচ্ছে ব্যবস্থা নেবে।

কয়েকটা সপ্তাহ কেটে গেল কিংবা সপ্তাহ হয়ত কাটেনি। একা বন্ধ ঘরে থাকলে এক ঘণ্টা পুরো একটা দিন মনে হয়। আমি সময়ের হিসেব গোলমাল করে ফেলেছি।

একদিন একজন গার্ড এসে দরজা খুলে আমাকে বাইরে ডাকল তারপর আমার একহাতে ও তার একহাতে হ্যাণ্ডকাফ লাগিয়ে আমাকে নিয়ে চলল। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠবার সময় আমি হাঁফাচ্ছিলুম। খুবই দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি।

আমাকে যে ঘরে নিয়ে গিয়ে হাতকড়া খুলে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল সেই ঘরে একটা টেবিলের সামনে যে লোকটি বসে আছে তাকে দেখে রুশ মনে হয় না, হয়ত মোঙ্গল বা টার্টার দেশের মানুষ। মাথায় টাক, কুতকুতে চোখ, গোমড়া মুখ। মাথা নিচু করে কিছু লিখছিল। আমাকে তার সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে তা যেন সে জানে না, ঘাড় গুঁজে লিখেই চলেছে।

আমি পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকবার পর তার বোধহয় খেয়াল হল। কলম নামিয়ে রেখে আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইল। আমি ভয় পেয়ে গেলুম।

জার্মান ভাষায় আমাকে হুকুম করল, বোসো।

আমি বসলুম। তারপর যেসব প্রশ্ন শুরু হল তা আমি আগেও বহুবার শুনেছি এবং পরেও বহুবার শুনতে ও উত্তর দিতে হয়েছে।

কত বয়স? কোথায় জন্ম? বাবা মায়ের নাম? বিবাহিত কি না? জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত কি করেছি ইত্যাদি। কোনো ঘটনা চেপে যেতে

পারি কিন্তু মিথ্যা বলার উপায় নেই, ওরা ঠিক ধরে ফেলে।

প্রশ্নোত্তর শেষ হবার পর আমাকে আবার খুপরিতে ফিরিয়ে দেওয়া হল। সেই আরম্ভ হল। এরপর থেকে প্রতি সপ্তাহে আমাকে একবার দু'বার করে সেল থেকে বার করে ওপরে সেই ঘরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেই একই প্রশ্ন করা হয়। উত্তরগুলো ওরা লিখে নেয় এবং কোন্ প্রশ্নের কি উত্তর দিয়েছি সেটা ওরা পাতা উলটে আগের উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে। সামান্য তফাত হলেও ধমক দেয়।

ছোট ঘরে একা সময় কাটে না। কোনো কাজ তো নেই পায়চারি করি, ওঠবোস করি, না খাওয়া রুটি ভেঙে পুতুল তৈরির চেষ্টা করি, ছোট একটা ভাঙা সিমেন্টের টুকরো পেয়েছিলুম, সেটা দিয়ে মেঝেতে ছবি আঁকার চেষ্টা করি। মাঝে মাঝে ভাবি আমি কি অপরাধ করেছি যেজন্যে আমাকে এমন কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে।

একদিন সেই মোঙ্গল বা টার্টার লোকটি আমাকে কোনো প্রশ্ন করল না, শুধু বলল, একটা প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে তোমার আগেকার উত্তর মিলছে না। যাও তোমার সেলে ফিরে গিয়ে প্রশ্নগুলো আর উত্তরগুলো মিলিয়ে নাও। পরে তোমাকে আবার ডাকা হবে।

লোকটি কিন্তু প্রতিবার বেশ ভদ্রভাবে কথা বলে তবে আমার উত্তরে গরমিল থাকলে তখন ধমক দেয়।

কতদিন বা কত মাস কাটল কে জানে। শীত, ক্ষিধে, একঘেয়েমি, মানসিক চাপ আমাকে রীতিমতো দুর্বল করে দিয়েছে। একদিন আমাকে যখন ওপরে নিয়ে যাওয়া হল তখন একটা কাঁচের দরজায় নিজের চেহারা দেখে আমি নিজেকেই চিনতে পারলুম না। একি চেহারা হয়েছে? চোখ বসে গেছে, গাল ভেঙে গেছে, ভীষণ রোগা হয়ে গেছি। আমি ভেঙে পড়লুম। এরা আমাকে এইভাবে তিলে তিলে মারবে। আমি এতই নিরুৎসাহ হয়ে পড়লুম যে দুদিন খেতেই পারলুম না। আমার চিন্তাশক্তিও ক্রমশঃ কমে গেছে।

আবার ডাক পড়ল। এবার দেখলুম মোঙ্গল মানুষটি ছাড়া আরও দু'জন লোক রয়েছে।

একজন প্রশ্ন করল, হ্যাঁ হে, তুমি তো ব্রিটিশদের স্পাই ছিলে? তাই না? কি করতে সব স্বীকার কর।

আমি বললুম, আমি তো আগে স্বীকার করেছি যে আমি জার্মান সুজ স্ট্যাফেল, যাকে আপনারা এস এস বলেন, যাদের কাজ হল পুলিসের সঙ্গে কাজ করা, তাদের সঙ্গে আমি জড়িত হয়ে পড়েছিলুম। এস এস নাৎসী পার্টির একটা ডানা, সরকারী কিছু নয়! এস এসের সঙ্গে জড়িত থাকলে ব্রিটিশদের সঙ্গে যোগাযোগ অসম্ভব।

ওরা আমাকে কিছু জেরা করে বুঝল যা বলছি সত্যই বলছি তাই আমাকে অন্তত সেদিনের মতো ছেড়ে দিল।

সেলে ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়লুম। অনেকদিন পরে বেশ ভাল ঘুম হল। আমার মনে হল ওরা বোধহয় আমাকে অন্য কোথাও পাঠাবে। কে জানে কোথায়? হয়তো এর চেয়ে ভালও হতে পারে, আবার নাও পারে। তবে এর চেয়ে আর খারাপ কি হতে পারে? যদি সাইবেরিয়াতে লেবার ক্যাম্পে পাঠায় তাহলে তো মরেই যাব। সেই ভালো। এ জীবন আর সহ্য হচ্ছে না।

ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে। মগে জল নেই। দরজায় ধাক্কা দিতে আরম্ভ করলুম। গার্ড এল, বললুম ভীষণ তেষ্টা, গলা শুকিয়ে গেছে, জল দাও।

জল নেই, বলে গার্ড চলে গেল। আমি গলায় হাত বুলোতে বুলোতে পায়চারি করতে লাগলুম।

কতক্ষণ কেটে গেছে কে জানে, ঘণ্টা দুই হবে হয়তো। দরজা খুলে গেল, দু'জন গার্ড এসে আমার হাতে হাতকড়া লাগিয়ে দিয়ে আবার সেই জিজ্ঞাসাবাদের ঘরে নিয়ে গেল।

সেই লোকটি যাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল টার্টার দেশীয় সে আমাকে দেখে হাসল। হাসে কেন? কি মতলব আছে কে জানে?

আরও দু'জন বসেছিল, তারাও আমাকে আগে জেরা করেছিল। তিনজনেই জাগ থেকে আরাম করে বিয়ার পান করছে। একজন আবার জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে। এ বোধহয় কখনও বিয়ার পান করে নি।

প্রথমজন তার বিয়ারের জাগ টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে কয়েকখানা টাইপ করা কাগজ আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, সই কর তারপর বল ব্রিটিশদের হয়ে তুমি কি গুপ্তচরগিরি করেছিলে? তাহলে তোমাকে বিয়ার পান করতে দেওয়া হবে।

এ তো আচ্ছা মুশকিলে পড়া গেল। আমি তো আগেই যা সত্যি তাই বলেছি, ব্রিটিশদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক ছিল না, এখন যদি মিথ্যে কথা বলি তাহলে হয়তো পুরো এক বোতল বিয়ার দেবে। কিন্তু আমি এখন বেপরোয়া। কতদিন পেটে একফোঁটাও বিয়ার পড়ে নি তার ওপর এখন জল-তেষ্টায় গলা কাঠ।

আমি কোনো কথা না বলে বিয়ার ভর্তি একটা জাগ তুলে নিলুম, কিন্তু চুমুক দিতে হল না তার আগেই আঘাত পড়ল জোরে একটা ঘুঁসি আর মাথায় রুলের বাড়ি। মাটিতে পড়ে গেলুম। পাঁজরে, কোমরে, মুখে, মাথায়, বুটের আঘাত। রক্ত বেরিয়ে পড়ল। মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। চোখে অন্ধকার। আমি কেঁদে ফেললুম। কেন এই অত্যাচার? সত্যি কথা বলেছি বলে? কিছু অন্যায় করিনি বলে?

অনাহারের ফলে কাবু হয়ে পড়েছি। তার ওপর কর্তাদের গা জ্বালা করা ঠাট্টা আর বিদ্রূপ, মাঝে মাঝে এই অত্যাচার। কত সহ্য করতে হবে কে জানে?

আমাকে আবার অন্ধকূপে ফিরিয়ে দেওয়া হল। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, গলা শুকিয়ে কাঠ। তার ওপর নির্মম প্রহার। সারা দেহে

মুখে ও মাথায় তীব্র যন্ত্রণা। জলের জন্যে বার বার দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলুম, 'আমাকে জল দাও' শব্দগুলো ভাল করে বেরোচ্ছে না, কিরকম একটা কাৎরানি বেরোচ্ছে।

আমি যেন পাগল হয়ে গেছি। কুঠুরির মধ্যে হামাগুড়ি দিতে লাগলুম। বুঝতে পারছি বাইরে গার্ডরা কথা বলছে, ভেতরটা দেখবার জন্যে দরজায় ফুটো আছে তার ভেতর থেকে আমাকে দেখছে।

আমি পাগলের মত চিৎকার করতে লাগলুম গার্ডরা চলে গেল। তারা কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে দরজা খুলল। আমি তখন মেঝেতে পড়ে আছি। ক'জন এসেছে জানি না, কয়েক জোড়া চোখ দেখতে পেলুম। ওরা আমাকে তুলে বেঞ্চিতে শুইয়ে দিয়ে চেপে ধরে রইল। বাহুতে কে ছুঁচ ফুটিয়ে দিল। চোখের সামনে লোকগুলো আবছা হতে হতে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি অজ্ঞান হয়ে গেলুম।

একসময়ে জ্ঞান হল, উঠে বসলুম। ভীষণ দুর্বল মনে হচ্ছে। জলের টিনটার দিকে হাত বাড়ালুম, তলায় যদি একটুও জল থাকে? হাত দিতেই টের পেলুম কখন জল ভর্তি করে দিয়ে গেছে। মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত পথিকের ওয়েসিস দেখে যে আনন্দ হয় আমার তার চেয়েও বেশি আনন্দ হল। জল যে এত মিষ্টি কে জানত?

এরপর কয়েকটা মাস একই রুটিনে জীবন চলতে লাগল। মাঝে মাঝে গার্ডরা ধরে নিয়ে যায়, জেরা চলে, একই কথা বারবার বলি, ওরাও বারবার প্রহার করে, নতুন কোনো কথা বার করতে পারে না।

ওরা বোধহয় শেষপর্যন্ত হতাশই হল। হয়ত ভাবল যে আমার কিছু হবে না, ওকে অন্য কোথাও পাঠান হোক, যা করবার তারা করবে। কিন্তু তখন কি আমি জানি যে আমার বিচারের জন্যে ওরা আমাকে অন্য জায়গায় পাঠাচ্ছে?

ওরা আমাকে পাঠাল লিখটেনবার্গ জেলখানায়। জেলখানার বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে একটা মস্ত বড় হলঘরে নিয়ে

গিয়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল।

ঘরের এক প্রান্তে বেশ লম্বা চওড়া বড় একটা টেবিল ঘিরে কুড়িটা চেয়ার। টেবিলে রয়েছে ছোট একটা লাল পতাকা, লেনিন ও স্ট্যালিনের রঙিন ছবি। দু'টি ছবিরই নিচে ওঁদের বাণী লেখা রয়েছে। এ ছাড়া সমস্ত হলঘরটা ফাঁকা।

কয়েক মিনিটের মধ্যে সার দিয়ে তিনজন পুরুষ ও একটি যুবতী প্রবেশ করল। প্রথমজনের পরণে মিলিটারি ইউনিফরম, দ্বিতীয়জনের নেভি ইউনিফরম, তৃতীয়জনের পরণে কোনো ইউনিফরম নেই, সাধারণ সিভিলিয়ান পোষাক, এঁর মাথার সব চুল রুপোর মতো শাদা। পরে জানতে পেরেছিলুম ইনি বিচারপতি। যুবতীর পরণে লম্বা ঝুলের স্কার্ট ও ব্লাউস। বয়স কুড়ি বাইশ হবে। যুবতী দোভাষীর কাজ করবে।

ইউনিফরম পরা একজন লেফটেনাণ্ট ঘরে ঢুকল, এ নাকি এই আদালতে আমার পক্ষ সমর্থন করবে। কিসের ভিত্তিতে আমার পক্ষ সমর্থন করবে জানি না কারণ আমার তো কোনো সাক্ষী সাবুদ, প্রমাণ বা দলিল কিছুই নেই। এটা একটা একতরফা বিচারের প্রহসন তা আমি একটু পরেই মর্মে মর্মে টের পেলুম।

মিলিটারি ইউনিফরম পরা প্রথম দু'জন কিছু বলল, আমার লেফটেনাণ্ট উকিল কিছু বলল। দোভাষী মেয়েটি আমাকে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি এবং আমার উকিল যা বলেছিল তার ইংরেজি ভাষ্য আমাকে শুনিয়ে দিল। সবই মিথ্যা অভিযোগ। আমাকেও কিছু বলতে দেওয়া হল না।

জজসাহেব সর্বক্ষণ নীরব ছিলেন। তিনি সব শুনলেন তারপর একটা মোটা খাতা খুলে কিছু লিখলেন তারপর রায় দিলেন। আমি নাকি জার্মান স্টর্ম ট্রুপারের দলে থাকার সময় ব্রিটিশদের হয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে গুপ্তচরগিরি করেছিলুম এবং এই গুরুতর অপরাধের জন্যে আমাকে পঁচিশ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হল। এটা তো হল প্রথম অভিযোগ। দ্বিতীয় অভিযোগ হল যে আমি অনেক স্যাবোটাজ

করেছি, সেজন্যে পঁচিশ বছর। তৃতীয় একটা অভিযোগও আছে, আমি স্পাই, সেজন্য আরও পঁচিশ বছর। এই দণ্ডগুলো অবশ্য একই সঙ্গে চলবে। প্রথমে আমাকে পাঠানো হবে একটি রুশ লেবার ক্যাম্পে এবং কারাদণ্ডের শেষ পাঁচ বছর আমাকে কোনো উপযুক্ত জায়গায় নির্বাসনে পাঠানো হবে, অবশ্যই রাশিয়ার ভেতরে।

মনে মনে হিসেব করে দেখলুম যে জেলখানা থেকে যদি বেরিয়ে আসতে পারি তাহলে তখন আমার বয়স হবে ছেষট্টি।

আমাকে গার্ডরা নিয়ে গিয়ে জেলখানার একটা ঘরে ঢুকিয়ে দিল। যে খুপরিতে আমাকে রাখা হয়েছিল এ ঘরটা তার চেয়ে কিছু বড় হলে কি হবে, ঘরে আরও পাঁচজন রয়েছে। ছ'জনের পক্ষে ঘরখানা খুবই ছোট।

আমরা এই ছ'জনেই আগে দীর্ঘদিন সেলের মধ্যে একা বন্দী ছিলুম। মন খুলে কারও সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাই নি। সারা দিন রাত্রি মুখ বুঁজে থাকতে হত। এইজন্যে আমরা ছ'জনেই যখন কথা বলতে আরম্ভ করলুম তখন মনে হল ঘরখানিতে ভীষণ গোলমাল হচ্ছে। আমরা নিজেরাই বিরক্ত হলুম।

লিখটেনবার্গ জেলখানায় আমাদের ছ'মাস অপেক্ষা করতে হল। আমাদের দণ্ড অনুমোদিত হয়ে মস্কো থেকে অর্ডার না আসা পর্যন্ত বন্দীদের অন্যত্র সরানো যাবে না বা দণ্ড কার্যকরী করা যাবে না।

এখন বোধহয় শরৎকাল। আমরা মাঝে মাঝে পাখির ডাক, ছোট ছেলেমেয়ের হাসিকান্নার আওয়াজ শুনতে পেতুম। এরা তাহলে আছে? কতদিন এদের কোনো আওয়াজ শুনি নি। ভালোই লাগত।

রাত্রে ঐটুকু ঘরে আমরা হাত পা ছড়িয়ে শুতে পারতুম না, হাত পা গুটিয়ে শুতে হত। ভালো ঘুম হত না। যদিও বা কিছুক্ষণ ঘুমোতুম তো আমাদের মধ্যে অকস্মাৎ কারও ভীতিপূর্ণ চিৎকারে ঘুম ভেঙে যেত। দুঃস্বপ্ন দেখে চিৎকার করত। ঘুমের ঘোরে কেউ বকবক করত।

এই জেলখানারই এক প্রান্তে ছিল মেয়েদের জেল। একদিন একজন গার্ড আমার হাতে একটুকরো কাগজ লুকিয়ে গুঁজে দিল। দৈত্যপুরীতে তাহলে এমন গার্ডও আছে যার শরীরে একটু দয়ামায়া আছে।

চিরকুটখানা আমিও লুকিয়ে দেখি। আরে এ যে আমার বৌ অ্যানালিসা লিখেছে। খুবই সংক্ষেপে লিখেছে। সে মেয়েদের ব্লকে আছে। তিন বছর মেয়াদ হয়েছে। বিকেলে মাঠে যখন একসারসাইজ করাবার জন্যে আসবে তখন আমার দেখা পাবে।

আমি ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠলুম, উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলুম। দুঃখ কষ্ট সাময়িকভাবে ভুলে গেলুম।

একসারসাইজ করতে যাবার সময় একজায়গায় কয়েকটা সিঁড়ি ভাঙতে হয়। প্রথমে চিনতে পারি নি তবুও কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে অ্যানার সঙ্গে দেখা তো হল? অ্যানা ন্যাতা দিয়ে সিঁড়ি মুছছিল। অস্ফুট স্বরে বলল, 'সাহস রাখ, ভালবাসা।'

আমিও যেমন তার বেশবাস ও হাড্ডিসার চেহারা দেখে মর্মাহত হয়েছিলুম, অ্যানাও আমার চেহারা দেখে কষ্ট পেয়েছিল। দাঁড়িয়ে দু'দণ্ড কথা বলার উপায় নেই। এগিয়ে যেতে হল। যে অবস্থাতেই দেখি না কেন, অ্যানাকে দেখার পর আমার শরীরে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে গেল, আমি শিহরিত। আমার জন্যে চিন্তা করবার জন্যে এক-জনও আছে। ওর জন্যে অন্তত আমাকে বাঁচতেই হবে।

নিজের জীবনের ওপর যে একটা বিতৃষ্ণা এসেছিল সেই বিতৃষ্ণা দূর হল। নতুন প্রেরণা পেলুম। আমি তো অ্যানালিসাকে খরচের খাতায় লিখে দিয়েছিলুম কিন্তু এখন তাকে দেখে আমি নতুন আশা দেখতে পাচ্ছি।

আমরা অতি গোপনে সেই লোকটি মারফত চিরকুট চালাচালি করতে লাগলুম। একসারসাইজের সময় দৃষ্টি বিনিময় বা কাছে যেতে পারলে এবং গার্ড দূরে থাকলে দু'একটা কথাও বলা যেত।

একদিন মেয়েদের ওয়ার্ড থেকে তীব্র চিৎকার ও আর্তনাদ শোনা গেল। এরকম চিৎকার ও আর্তনাদ আমরা আগেও শুনেছি। মেয়েদের ওয়ার্ডে নতুন কোনো গার্ড এলে সে কোনো কোনো মেয়েকে জড়িয়ে ধরে, তার জামা ধরে টানাটানি করে, জোর করে চুম্বন করে বুক মুচড়ে দেয়। তখনই এইরকম চিৎকার শোনা যায়। কিন্তু মেয়েগুলির চেহারা বর্তমানে যেরকম হয়েছে তাতে তো তাদের মেয়ে বলে চেনাই যায় না। চুলে জটা, গাল ভেঙে গেছে, বুক সমতল হয়ে গেছে, গায়ে ময়লা ও দুর্গন্ধ। তবুও বর্বর গার্ডগুলোর দয়া হয় না।

অ্যানালিসার সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার পর এই প্রথম চিৎকার শুনলুম। এবার চিৎকার আরও তীব্র, আরও করুণ। কোনো মেয়েকে বোধহয় চাবুক মারা হচ্ছে। তার কান্না ছাপিয়ে চাবুকের শব্দ শোনা যাচ্ছে। সহ্য করা যায় না।

কান্নাটা চেনবার চেষ্টা করলুম, অ্যানা নয় তো? আমি ক্ষেপে উঠলুম। মেয়েদের ওয়ার্ডের দিকে আমি ছুটে গেলুম। প্রথম দরজায় জোরে কিল ঘুঁসি মারতে লাগলুম। হাত কেটে রক্ত বেরোতে লাগল। বুঝলাম হাতে হবে না। জমাদারের একটা বালতি পড়ে ছিল। সেইটে তুলে নিয়ে সেটা দিয়ে আঘাত করতে লাগলুম। আমার দেখাদেখি আরও কয়েকজন ছুটে এসে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল আর সেই সঙ্গে গার্ডদের উদ্দেশ করে অশ্লীল ভাষায় গালাগাল।

তখনও চাবুকের শব্দ শোনা যাচ্ছে। মেয়েটা এখন আর চিৎকার করছে না, তার গলা থেকে একটা কাতর ধ্বনি বেরিয়ে আসছে।

আমার জন্যে সেই গার্ডের হাতে চিরকুট দেবার সময় অ্যানালিসা কি ধরা পড়ে গেছে? তাই এই নিষ্ঠুর নিপীড়ন?

দরজার ওপারে বুটের আওয়াজ ও খিল খোলার আওয়াজ শুনলুম, দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে যাকে দেখতে পেলুম তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লুম। আমার ওপরও অজস্র কিল ঘুঁসি বর্ষিত হতে লাগল। ভারি বুটের আঘাত এবং পরে মাথায় রুলের আঘাত। আমি অ্যানালিসা,

অ্যানালিসা বলে চিৎকার করতে করতে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলুম।

যখন জ্ঞান ফিরে পেলুম তখন দেখি আমি একলা একটা খুপরিতে শুয়ে আছি। আমি জানি এগুলো পানিশমেণ্ট সেল। শোবার জন্যে খাট বা বেঞ্চি কিছুই নেই, জল পান করবার পাত্রও নেই। কম্বলও নেই। শুধু মেঝেতে শুতে হবে।

আমাকে প্রচণ্ডভাবে মেরেছিল। কিন্তু যে মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছি সে তুলনায় দু'চারটে কিল ঘুঁসি আমার কিছুই করতে পারে না। লক্ষ্য করলুম আমার দেহ থেকে রক্ত বেরিয়ে মেঝেতে গড়িয়েছে। আমাকে এক সপ্তাহ এই খুপরিতে রাখা হয়েছিল। গায়ে নানা জায়গায় কালসিটে পড়ে গেছে, ফোলাগুলো কিছু কমেছে।

একজন গার্ড আমাকে চুপিচুপি বলল যে সেদিন তোমার বৌ অ্যানালিসাকে চাবুক পেটা করা হচ্ছিল না, অন্য একটা মেয়ে। গার্ড আমাকে হয়ত আরও কিছু বলত কিন্তু পায়ের শব্দ পেয়ে চুপ করে গেল। সে লোক চলে যাবার পর গার্ড আবার কথা বলল। ফিসফিস করে বলল অ্যানালিসাকে অন্য বন্দীশালায় পাঠান হয়েছে। তাহলে তো আর আমার সঙ্গে অ্যানালিসার দেখা হবে না। আমি হতাশ হলুম।

পরের দিন ৫০০ বন্দীকে জেলখানার বড় উঠোনে সারবন্দী করে দাঁড় করানো হল। তারপর ছোট ছোট দলে ভাগ করে একজনের সঙ্গে আর একজনকে শৃঙ্খলিত করা হল। সকলে শৃঙ্খলিত হবার পর আমাদের হাঁটিয়ে একটা রেলওয়ে ইয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হল। সঙ্গে চলল রাইফেল ও লাইট মেসিনগানসহ প্রহরী ও কয়েকটা কুকুর। কোনো বন্দী যেন পালাতে না পারে।

এক একটা ওয়াগনে একশজন করে বন্দী তোলা হল ও শৃঙ্খল খুলে নেওয়া হল। দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দেওয়া হল। ওয়াগনটা অন্ধকার হয়ে গেল।

মালগাড়ির ওয়াগন চারদিক বন্ধই থাকে। ওয়াগনটা একশজনের পক্ষে নোটেই উপযুক্ত নয় অথচ আমাদের ভেড়ার পালের মতো এর মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভেতরে ভীষণ দুর্গন্ধ তবে কিছুক্ষণ পরে নাক বোদা হয়ে যায় তাই গন্ধটা সহ্য হয়ে যায়। কিন্তু ভেতরে তো হাওয়া ঢোকবার পথ নেই। দম বন্ধ হয়ে আসছে।

ট্রেন চলছে তো চলছে। রাত্রি দিন আমরা বুঝতে পারছি না। একসময়ে জানতে পারলুম সকাল হয়েছে। ওয়াগনের মাথায় একটা ফুটো ছিল, সেই ফুটো দিয়ে ভেতরে একটু আলো ঢুকলো।

ট্রেন চলছে তো চলছেই। জল ও কয়লা নেবার জন্যে মাঝে মাঝে থামে। কয়েকদিন পরে বেশ শীত করতে লাগল। যতই এগিয়ে যাই শীত ততই বাড়ে। হঠাৎ একসময়ে ওয়াগনের দরজা খুলল। খোলার সঙ্গে সঙ্গে ধারালো ক্ষুরের মতো ঠাণ্ডা বাতাস আমাদের দেহে এসে বিঁধলো তবুও ভালো লাগল। কতদিন আকাশ দেখিনি, গাছ দেখিনি, মাঠ দেখিনি। কিন্তু এই শীতে আমাদের খোলা মাঠে নামিয়ে দেবে নাকি?

না তা নয়। বাইরে সশস্ত্র গার্ড দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের ওয়াগনের ভেতরে একটা জ্বলন্ত উনুন তুলে দেওয়া হল। উনুনটা রইল ওয়াগনের মাঝখানে। খোলা উনুন নয়। চারদিক ঢাকা তবে মাঝে মাঝে ফাঁক আছে। ফাঁক দিয়ে আগুনের আভা দেখা যাচ্ছে। সেই আভায় ওয়াগনের অন্ধকার কিছু দূর করল।

ভাগ্যক্রমে ঐ উনুন বা স্টোভের পাশেই আমি জায়গা পেয়েছিলুম। আমার পাশে বেশ লম্বা একটি ছোকরা বসেছিল। সে কোথা থেকে বেশ বড় একখণ্ড চট পেয়েছিল। সেইটে ছড়িয়ে বসেছিল। আমাকে বলল চটের ওপর বসতে।

কথায় কথায় ছোকরা বলল এখানে ওর দু'জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে। একজন উক্রেনের ছেলে, অপরজন পোল্যাণ্ডের ছেলে। ওরা তিনজনে মিলে একটা প্রতিরোধ করার দল তৈরি করেছে, নাম দিয়েছে ব্যাণ্ডেরস।

আমি কি ওদের দলে যোগ দোব ? ছোকরা জিজ্ঞাসা করল। ওদের আত্মবিশ্বাস দেখে আমি রাজি হলুম। ছোকরাটি বুলগেরিয়ার সন্তান বলে মনে হল।

প্রাকৃতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করবার জন্যে দিনে মাত্র একবার ট্রেন থামানো হয়, তারপর আবার চলতে থাকে। বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। প্রহারের ফলে একেই তো আমার ও অনেকের আঙুলের গাঁট হাঁটু ইত্যাদি ফুলে আছে। বাইরে ঠাণ্ডায় আমরা ভালো করে হাতমুখ ধুতে পারি না। জল যা দেওয়া হয় তা বরফ-শীতল।

আটদিন পরে ট্রেন থামল ব্রেস্ট-লিটভস্ক শহরে। ট্রেন থেকে নামিয়ে আমাদের জেলে পোরা হল। আসবার সময় ট্রেনে দশজন মারা গেছে। তারা মরে বেঁচেছে। আমাদের যে কতদিন যমযন্ত্রণা সহ্য করতে হবে কে জানে ?

জেলখানার ভেতরে আমাদের সকলকে উলঙ্গ করে শরীরের জীবাণু মারবার জন্যে বাষ্পস্নান করানো হল। বাষ্পে কোনো ওষুধ মেশানো ছিল।

এখানকার জেলখানায় আমাদের চৌদ্দদিন আটক রাখা হল। শুনলুম এবার আমাদের আবার ঐ ট্রেনে তোলা হবে।

ট্রেনে ওঠবার জন্যে আমরা অপেক্ষা করছি এমন সময় একজন রুশ এসে আমার কোটের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, কোটটা খুলে দাও। আমি বললুম, না খুলব না।

তার কয়েকজন সঙ্গী আমার গা থেকে কোটটা খুলে নেবার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে হাত পা দুই চালালুম। ওরা ছিটকে পড়ল। আমাকে আর ঘাঁটাবার চেষ্টা করল না।

তারপর আমি শুনলুম কে যেন ব্যাণ্ডেরস, ব্যাণ্ডেরস বলে প্রায় চিৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে একজোড়া বলিষ্ঠ হাত আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, তোমার সাহস আর ক্ষমতা দুইই আছে বটে ইংলিশম্যান।

এ সেই বুলগেরিয়ান ছোকরা। সে ও তার দু'জন সঙ্গী আমাকে উদ্ধার করবার জন্যে এগিয়ে আসছিল কিন্তু আমি তার আগেই আমার দুশমনদের হটিয়ে দিয়েছি।

আমি আশঙ্কা করছিলুম যে আমাকে হয়তো এখানেই আটকে রেখে কঠোর শাস্তি দেবে কিন্তু সেরকম কিছু ঘটল না। আমাদের সকলকে ভেড়ার পালের মতো ট্রেনে তোলা হল।

বুলগেরিয়ান ছেলেটির নাম ভ্যালশফ। তার কাছে শুনলুম ব্যাণ্ডেরসরা হল উক্রেনের বিদ্রোহী নেতা স্টিভেন ব্যাণ্ডেরসের সমর্থক। তাই এদের ব্যাণ্ডেরস বলা হয়। অনেক ব্যাণ্ডেরসকে এন কে ভি ডি-এর লোকেরা জেলে পুরেছে। জেল থেকে তারা বোধহয় আর কোনোদিনই বেরোতে পারবে না।

ব্যাণ্ডেরসরা নিরুৎসাহ হয়নি। তারা গোপনে কাজ করে যাচ্ছে। তারা অনেক ক্যাম্পের কর্তাদের এমনকি এন কে ভি ডি-এর লোকদেরও গোপনে খুন করেছে। ওরা এতই দুঃসাহসী যে অমন যে দুর্ধর্ষ এন কে ভি ডি, তারাও ওদের ভয় করে। আমিও স্থির করলুম ব্যাণ্ডেরসদের সঙ্গে থাকব।

অরশাভ নামে কোনো একটা জায়গায় আমাদের নামানো হল তারপর ষাটজনকে একটা ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। দ্বিতীয় দিনে একটা খুন। একটি জার্মান ছোকরার কাছে খানিকটা তামাক ছিল। কেউ কেউ ভাগ চেয়েছিল কিন্তু জার্মান ছোকরা ভাগ দেয়নি। কার কাছে একটা ছোরা লুকানো ছিল। ক্ষিপ্ত হয়ে সে ছোরা এমন বসিয়েছে যে এক ঘায়েই ছোকরা খতম।

একদিন একটা শব্দ আমার কানে এল, 'ব্ল্যাটনয়'। সেটা আবার কি? শুনলুম কিছু বাছা বাছা কয়েদী আছে যারা বিশেষ সুবিধা ভোগ করে, তারা ভাল খেতে পায়, ভাল পরতে পায়, মাঝে মাঝে দু'-এক টুকরো সাবান পায়।

অ্যামেরিকায় যেমন মাফিয়া নামে একটা দুষ্টচক্র আছে, রাশিয়াতেও নাকি ব্ল্যাটনয় নামে একটা দুষ্টচক্র আছে তবে গুপ্ত। ক্রিমিনাল ব্রাদারহুড। এদের নিজস্ব কমিটি আছে, তার বৈঠক বসে, নিজেদের বিশেষ আইনকানুন আছে। কোনো মেম্বার বিপদে পড়লে, তাকে সাহায্য করা হয়। সরকারী ও পুলিসমহলে তারা ঘুষ দিয়ে অনেককে হাত করে রেখেছে। পুলিস নাকি এদের ঘাঁটাতে সাহস করে না।

ব্ল্যাটনয়দের পরিচিতি কার্ড দেওয়া হয়। তারা সেই কার্ড সঙ্গে রাখে। শহরে তারা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

আমাদের বন্দীশালায় কিছু ব্ল্যাটনয় আছে শুনলুম। তারা নাকি অপর বন্দীদের ওপর ছড়ি ঘোরায়, কোনো কাজও করে না। বেশ মজা তো!

ব্ল্যাটনয়দের সংগঠনে প্রতিটি মেম্বারের র‍্যাঙ্ক আছে, এক নম্বর, দু' নম্বর বা তিন নম্বর শ্রেণীর। এইরকম আর কি। জেলে গেলেও তার র‍্যাঙ্ক অর্থাৎ পদমর্যাদা তা যতই ছোট হোক তা এবং তার পদানুযায়ী ক্ষমতাও বজায় থাকে।

কিন্তু সোভিয়েট সরকার ব্ল্যাটনয়দের সহ্য করছে কি করে?

শুনলুম সোভিয়েট সরকার গঠিত হওয়ার আগে থেকেই ব্ল্যাটনয়দের অস্তিত্ব ছিল। কমিউনিস্ট পার্টির জন্যে অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত ব্ল্যাটনয়রা ডাকাতি পর্যন্ত করত। এক অর্থে এটি একটি বিপ্লবী সংগঠন ছিল। স্ট্যালিন নিজেও নাকি ব্ল্যাটনয় ছিল। বর্তমানে তাদের বুঝি চরিত্র বদলেছে।

অবশেষে একদিন আমাদের যাত্রা বুঝি শেষ হল। সাইবেরিয়ার উত্তর প্রান্তে মেরু সীমানার মধ্যে ইণ্টা স্টেশনে আমাদের নামানো হল। রুশরা ইণ্টাকে বলে 'সিটি অফ দি লস্ট'। সিটি বলতে এখানে কিছু নেই যা আছে তা হল সার সার ব্যারাক। শুনলুম ব্যারাকে

পঁয়তাল্লিশ হাজার কয়েদী রাখবার ব্যবস্থা আছে। বিরাট লেবার ক্যাম্প। রাশিয়ার বিরুদ্ধে যারা যায় তাদের এই লেবার ক্যাম্পে পাঠানো হয়। মেয়াদ কেউ কি শেষ করে আবার নিজের বাড়ি ফিরে যেতে পারে? কেউ কেউ ভাগ্যবান আছে হয়তো।

এখানে প্রচণ্ড শীতের সঙ্গে মোকাবিলা করবার মতো আমাদের শীতবস্ত্র নেই। শীতেই কতজন মারা যায়। ভীষণ ঠাণ্ডা বাতাস হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়, ধারালো স্টেনলেস স্টীলের ব্লেড দিয়ে যেন দেহের ত্বক কেটে দেয়।

খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে আমরা ঠকঠক করে কাঁপছি, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। শরীর কিছু গরম রাখবার জন্যে বা হাত পা যাতে জমে না যায় সেজন্যে আমরা নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়িয়ে লাফাচ্ছি হাত পা ছুঁড়ছি বা ওঠবোস করছি।

ট্রেনে আসবার সময়ে বন্ধ ওয়াগনে এবং পরে বন্ধ ট্রাকে আমরা শীত টের পাচ্ছিলুম। তখন আমরা পুরনো খবরের কাগজ বা চট যা পাচ্ছিলুম হাতের কাছে তাই গায়ে চড়াচ্ছিলুম কিন্তু তাতে কি শীত আটকায়?

আমাদের যারা গার্ড তাদেরও শাস্তিস্বরূপ এখানে ডিউটি দিতে পাঠানো হয়। তারা আমাদের বারবার গুণতে লাগল। কিন্তু দেখলুম তারা গুণতেও জানে না। বার বার গুণছে আর খেই হারিয়ে ফেলছে। পথে কতজন মরেছে তা তারা কিছুতেই ঠিক করতে পারছে না। কারো মতে দশজন কারো মতে বারো বা চৌদ্দজন।

কুকুরগুলো পেট ভরে খেতে পায়নি। সেগুলো ছটফট করছে। কুকুরগুলোকে গা শুঁকিয়ে বন্দীদের চিনিয়ে রাখা হয়েছে। শেকল বেঁধে তাদের আটকে রাখা যাচ্ছে না। ক্ষুধার্ত কুকুরগুলোকে ছেড়ে দিলে বোধহয় আমাদেরই ছিঁড়ে খাবে।

আমাদের মার্চ করার আদেশ দেওয়া হল। পা আর চলছে না। প্রচণ্ড শীত, উপযুক্ত গরম পোশাক গায়ে নেই, জুতোও এদেশের

উপযুক্ত নয়। আর পা চলবে কি করে গত দশ ঘণ্টা পেটে ত কিছুই পড়েনি।

দু' ঘণ্টা চলার পর আমরা ৫ নম্বর লেবার ক্যাম্পে পৌঁছলুম। ব্যারাকে যে ঘরে একশ জন থাকতে পারে না সেইরকম একটা ঘরে দুশো চল্লিশ জনকে পুরে দেওয়া হল। ঘরের মধ্যে অবশ্য বাঙ্ক আছে। বাঙ্কগুলো কতটা মজবুত কে জানে, তাছাড়া যথেষ্ট চওড়া নয়। সেই জন্যে যারা রোগা ও মাথায় খাটো তাদের বাঙ্কে শোবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

আমাদের প্রত্যেককে এক বস্তা করে খড় আর একখানা করে কম্বল দেওয়া হল। সেগুলো নিয়ে আমরা ঘরে ঢুকলুম। ঘরে জানালা নেই, দুর্গন্ধে ভর্তি। ঘরের দু' প্রান্তে দুটো স্টোভ জ্বলছে। ঘরটা মোটামুটি গরম। ঘরের বাতাস বেরোবার কোনো ব্যবস্থা নেই।

খাবার এল। কি খাবার? বড় বড় বালতি ভর্তি বাঁধাকপির স্যুপ আর প্রত্যেকের জন্যে এক পাউণ্ড করে একখানা পাঁউরুটি।

খাবার পাওয়া মাত্র কেউ কেউ রাক্ষসের মতো খেতে লাগল। ভাগ্যে যা স্যুপ পড়েছিল আর রুটি চক্ষের নিমেষে উড়ে গেল। পরে কেউ অন্য কোনো দ্রব্য বিনিময় করত। একধরনের ব্ল্যাকমার্কেটিং চালু হয়ে গিয়েছিল।

একসময়ে আমাদের ব্যারাকে একজন লোক এল। আমাদের মতো মলিন নয়। পরনে খাসা ফারের জ্যাকেট ও টুপি। পায়ে চকচকে গামবুট, হাতের গ্লাভস খুলতেই দেখা গেল তার আঙুলগুলোয় সোনার চকচকে আংটি ঝক্‌মক্ করছে। বন্দীদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল ব্ল্যাটনয়, ব্ল্যাটনয়।

এই কয়েকদিনের ভ্রমণে আমরা রীতিমতো ক্লান্ত। আমরা নিজেরা ইচ্ছামতো জায়গা বেছে নিয়ে খড় বিছিয়ে শুয়ে পড়লুম। একটু পরে নাসিকা গর্জনে সারা ঘর ভর্তি হয়ে গেল। ঘরের দুর্গন্ধ এড়াবার জন্যে আমি আমার মাথাও ঢেকে দিলুম। আমার একপাশে এক ডাক্তার

অপর পাশে উক্রেনের একজন চাষী।

আমিও রীতিমতো ক্লান্ত ছিলুম। অল্প সময়ের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লুম। ভারি সুন্দর স্বপ্ন দেখলুম। আমি আর অ্যানালিসা যেন বাড়ি ফিরে গেছি।

আমার ঘুম ভেঙে গেল গালাগালি আর মারামারির আওয়াজে। আমি উঠে বসলুম। আমার পায়ের দিক দিয়ে দু'জন ছুটে পালাল। একনজরে হাতে একটা বাণ্ডিলমতো কিছু দেখলুম।

আমার পাশে দেখি ডাক্তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে কাঁদছে। ডাক্তার কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমার রুটিখানা নিয়ে গেল। খানিকটা রুটি আমি খেয়েছিলুম, বাকিটা বেশ করে কাগজে মুড়ে মাথার নিচে রেখে শুয়েছিলুম। চোরগুলো রুটি চুরি করতেই এসেছিল অন্য ব্যারাক থেকে, আরো কারো রুটি গেছে বোধহয়।

পরদিন একজন আর্দালি এসে আমাদের বলে গেল আমরা এখনি যেন সর্দার কয়েদী নারাচিকের কাছে যাই, সে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। সে আমাদের কাজ ভাগ করে দেবে। এখানে বসে থাকবার জন্যে পাঠানো হয়নি। লেবার ক্যাম্প, খাটতেই পাঠানো হয়েছে।

বাইরে এসে আমি ভ্যালশফ আর তার দু'জন ব্যাণ্ডেরস বন্ধুদের খুঁজতে লাগলুম। বেশি খুঁজতে হল না। ভ্যালশফ ও তার দু'জন সঙ্গী দেখলুম কিচেনের জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমাকে দেখতে পেয়ে ইশারা করল, ঐখানেই অপেক্ষা করো, কোথাও যেও না।

একটু পরেই কিচেনের জানালাটা খুলেই বন্ধ হয়ে গেল। সেইটুকু সময়ের মধ্যে কে একখানা রুটি বাইরে ছুঁড়ে দিল। ভ্যালশফ সেখানা লুফে নিয়েই লম্বা কোটের মধ্যে লুকিয়ে ফেলল।

আমাদের ব্যারাকের ঘরে ঢুকে ভ্যালশফ খড়ের ওপর পাতা তোশকের নিচে রুটিখানা লুকিয়ে ফেলল। তারপর আমরা পায়চারি করতে লাগলুম।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, নারাচিক সর্দার যে ডেকে পাঠিয়েছে যাবে না?

গিয়েছিলুম। নারাচিক কি কাজ করছে, পরে যেতে বলল। ভ্যালশফ বলল।

ভ্যালশফের সঙ্গী সেই পোল ছোকরা পেট্রফস্কি বলল, তাহলে চল তার আগে আমরা রুটিখানার সদ্ব্যবহার করি।

রুটিখানা বার করবার জন্যে ভ্যালশফ তোশকের নিচে হাত ঢুকিয়ে দিল। কোথায় রুটি? চুরি হয়ে গেছে। রুটিখানা ওখানে রাখতে কেউ দেখেছিল। যখন আমরা পায়চারি করছিলুম সেইসময়ে চোর রুটিখানা হাতিয়ে নিয়েছে।

আমার ব্রিগেডের সকলেই নতুন। আমি কাউকে চিনি না। আমার ব্রিগেডে ছিল ১৫ জন জার্মান, ৩ জন এস্টোনিয়ান আর বাকি সব রুশ।

আমাদের পাঠান হল একজন এঞ্জিনিয়ারের কাছে। সে আমাদের কয়লা খনিতে কাজ করবার বিষয়ে পাঠ দিতে লাগল। কয়লা খনিতে কাজ করবার সময় কি কি বিপদ ঘটতে পারে, তাও আমাদের জানিয়ে দিল।

পরদিন একটা করে বেলচা ও সেফটি ল্যাম্প আমাদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে খনিতে নামিয়ে দেওয়া হল।

খনির ভেতরে নেমে আধ মাইল পর্যন্ত সোজা হয়ে হেঁটেই যেতে পারলুম তারপর ঘুলঘুলাইয়ের মতো সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে সোজা হয়ে, কখনও মাথা বাঁচিয়ে কোমর বেঁকিয়ে এমনকি হামাগুড়ি দিয়েও কাজের জায়গায় পৌঁছলুম।

খনির গা বেয়ে জল গড়াচ্ছে। আমাদের জামা ও ওভারল ভিজে গিয়েছিল। কাজের জায়গাতেও হুড় হুড় করে জল পড়ছে। আমাদের সঙ্গে যে দু'জন জার্মান ছিল তাদের অবস্থা শোচনীয়। বেচারারা

অপুষ্টিতে ভুগছিল, হাত পা ফুলে গিয়েছিল। এখন তো রীতিমতো ভিজে গেছে, ভিজে সপসপ করছে।

আমাদের সঙ্গে ব্রিগেডিয়ার রয়েছে তার গায়ে ওয়াটারপ্রুফ পোশাক রয়েছে। জার্মান দু'জনকে লক্ষ্য করে বলল, কি বাবু শীত করছে তাহলে যন্ত্র নিয়ে কাজে নেমে যাও। মনে রেখো আজ যে কাজ দেওয়া হয়েছে তা শেষ না হলে কেউ খেতে পাবে না। কাজ হল যে কয়লা জমা রয়েছে তা আজই ট্রলিতে বোঝাই করতে হবে।

ব্রিগেডিয়ার লোকটি রুশ নয়, জার্মান। সেই জন্যেই সে বোধহয় আমাদের দেখিয়ে দিল কি করে বেলচা দিয়ে কয়লা তুলে ট্রলিতে ভর্তি করতে হবে।

খনির ভেতরে কয়েক সপ্তাহ কাজ করবার পর আমার শরীরে নানা জায়গায় চর্মরোগ দেখা দিল। ভীষণ চুলকানি আরম্ভ হল, শরীরে নানা জায়গায় লাল ছোপ দেখা যাচ্ছে, পায়ের ক্ষতগুলো ঘা হয়ে গেল, যেন একটা কুষ্ঠরোগী।

একজন লেডি ডাক্তার আমাদের চিকিৎসা করত। তাকে দেখালুম, সে দেখে বলল কিছু করবার নেই কারণ আমাদের কাছে কোনো ওষুধ নেই। এদিকে একটা হাসপাতাল আছে। হাসপাতালে কিছু ওষুধ আছে। সবই কয়েকটা সাধারণ ওষুধ, বিশেষ রোগের কোনো ওষুধ নেই, এমন কি সালফা ড্রাগও নেই। হাসপাতালে যাদের ভর্তি করা হয়েছিল তাদের মধ্যে কয়েকজন তো মারাই গেল।

আরও একটা উৎপাত। দাঁত নড়তে লাগল। মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়ে। পায়ের ঘাগুলো তো দগদগে হয়ে গেল। সে এক অসহনীয় অবস্থা।

আমার দুরবস্থা দেখে ভ্যালশক কোথা থেকে কয়েকটা আলু চুরি করে আনল। পাইন গাছের সেই অদ্ভুত ফুল ও কিছু কাঁটা সংগ্রহ করে সেগুলো জলে বেশ করে সেদ্ধ করে আমাকে সেই বিস্বাদ জল খাওয়াতে লাগল আর সেইসঙ্গে আলু সেদ্ধ। কাজ হতে লাগল।

জানি না পাইন গাছের ফুলে কাঁটায় কি আছে, আমি সেরে গেলুম।

মেয়েদেরও কঠোর কাজ করতে হচ্ছে। তাদের দেখি আমাদের ক্যাম্পের পাশ দিয়ে তারা ছোট ঠেলাগাড়ি ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাচ্ছে। ঠেলায় নানারকম মাল বা ক্যাম্পের আবর্জনা থাকে।

নানা দেশের মেয়ে আছে। অনেকে রোগা, অনেকের স্বাস্থ্য তখনও বজায় আছে। কারও মাথার চুল রুক্ষ, কারও ঝুঁটি বাঁধা বা বিনুনি বাঁধা। সকলেরই গায়ের জামা বা ফ্রক ছিন্ন। কেউ ব্লণ্ড, কটা চোখ সোনালী চুল, কেউ ব্রুনেট, কালো চোখ কালো চুল। গার্ডদের উপেক্ষা করে তারা আমাদের দিকে চেয়ে হাসত।

প্রচণ্ড শীত সহ্য করা যাচ্ছে না। একেই ত উপযুক্ত জামা প্যাণ্ট নেই, তার ওপর পেটে এমন খাবার একটুও পড়ে না যাতে শরীর গরম রাখা যায়।

একদিন শীত সহ্য করতে না পেরে সঙ্গীদের একটু সরিয়ে ওরই মধ্যে একটু জায়গা করে নিয়ে আগুনে হাত পা সেঁকছি। এমন সময় আমাদের জার্মান ব্রিগেডিয়ার এল। সেও আগুনে হাত পা সেঁকবে কিন্তু জায়গা না পেয়ে আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরাবার চেষ্টা করল। আমি সরছি না দেখে আমার পিঠে লাথি মারল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে উঠে তার চোয়ালে মারলুম এক ঘুঁসি। সে প্রায় আগুনের ওপর পড়ল। যাইহোক তার তল্পিদাররা তাকে আগুনের ধার থেকে সরিয়ে দিল। তবুও দু'এক জায়গা পুড়েছে।

ভ্যালশফ ও পেট্রফস্কি সেখানে ছিল। তারা এই দৃশ্য দেখে হাসতে লাগল। ভ্যালশফ বলল, ইংলিশম্যান তোমার সাহস আছে বটে। যাইহোক আমরা তিনজনে তিনটে বাকেট যোগাড় করে তার ওপর বসে আগুন পোয়াতে লাগলুম।

ব্রিগেডিয়ারকে আঘাত করার জন্যে আমাকে একমাস সলিটারি সেলে আটকে রাখা হল। ভ্যালশফ আর পেট্রফস্কি আমাকে সমর্থন

করার জন্যে তাদেরও কয়েকদিনের জন্যে সলিটারি সেলে আটকে রাখা হল। চারদিন পরে ওদের ছেড়ে দেওয়া হল। ছাড়া পাবার পর ওরা দু'জনে একজন গার্ডকে প্রহার করে ফলে আবার একমাস নির্জন কারাবাস।

ভ্যালশফ একমাস পরে ছাড়া পাবার পর আমাকে একটা খবর দিল, ব্ল্যাটনয় তোমাকে খুন করবে বলে শুনছি, তবে যা বললুম তার বেশি কিছু জানি না, এরকম একটা কথা আমার কানে এসেছে।

পাঁচদিন পরে ব্যারাকে আমাদের ঘরে নতুন একজন বন্দীকে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। লোকটা বেশ লম্বা, সাড়ে ছ ফুট হবে বোধ হয়। দেখতে রোগা কিন্তু হাতের কব্জি বেশ চওড়া। মাথায় লম্বা চুল, কপালের ওপর চুল পড়ে একটা চোখ প্রায়ই ঢেকে রাখে। লোকটার দৃষ্টি চিলের মতো। লোকটাকে কেউ পছন্দ করল না। দু'-একজন কথা বলবার চেষ্টা করল কিন্তু সে যে কি বলল বা কি ভাষায় বলল তা কেউ বুঝতে পারল না।

ভ্যালশফ বলল, শয়তানের বাচ্চাটার ওপর নজর রাখতে হবে। আমার খটকা লাগছে। বেটা বোধহয় স্পাই।

লোকটা এসেছিল সকালে। সে ঘরের এক কোণে তার শোবার জায়গা ঠিক করে একটা চামড়ার হ্যাভারস্যাক রেখে কোথায় চলে গেল। সারাদিন তাকে দেখা গেল না। ফিরল সন্ধ্যার পর।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, তোমার কোথায় ডিউটি পড়েছে হে?

উত্তরে কি যে বলল আমরা কেউ বুঝলুম না। হাত বাড়িয়ে আঙুল দিয়ে একটা দিক দেখাল কিন্তু সেদিকে মেয়েদের ব্যারাক।

আমাদের মধ্যে একজন তার কথা বুঝতে পারল। সে তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করল। উত্তরও দিল।

সে সোভিয়েট রাশিয়ারই লোক। তাদের ভাষা অন্য, মূল রুশ ভাষা সে জানে না। তার ওপর কথায় জড়তা আছে। সে যা বলল আমাদের লোকটি তা আমাদের বুঝিয়ে দিল।

লোকটা বলেছে যে মেয়েদের ব্যারাকে টাইফাস দেখা দিয়েছে। কয়েকজন মারাও গেছে। তাই ডাক্তার হুকুম দিয়েছে যে মেয়েদের উলঙ্গ করে মাথার এবং শরীরের সমস্ত অপ্রয়োজনীয় চুল কামিয়ে পরিষ্কার করে দিতে হবে। এই কাজ করতে তাকে এখানে পাঠানো হয়েছে। আজ সে অনেক মেয়েকে ন্যাড়া ও নির্লোম করেছে। সে নাপিত। কাজ শেষ হলেই সে চলে যাবে।

আমি ভাবি কি ভীষণ বর্বরতা। মেয়েদের উলঙ্গ করে পুরুষ নাপিত দিয়ে তাদের ন্যাড়া ও নির্লোম করা হচ্ছে। অ্যানাকে তাহলে লোকটা ন্যাড়া করেছে বা করবে। আহা! অমন সুন্দর চুল অ্যানার, আবার কতদিনে বড় হবে কে জানে? তবে অ্যানা বোধহয় এই ব্যারাকে নেই, থাকলে তাকে একদিন দেখা যেত বা যেভাবে হোক আমার কাছে সে চিরকুট পাঠাত।

লোকটা নিজের খাবার নিজেই নিয়ে এসেছিল। রুটি, অনেকটা চিজ আর কিছু মধু। খাওয়া দাওয়া সেরে ঢেঁকুর তুলে সে নিজের জায়গায় যেয়ে শুয়ে পড়ল।

অনেক রাত্রে চাপা গোলমালে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি উঠে বসলুম। আমার বিছানা থেকে কিছু দূরে নাপিতটা চিৎ হয়ে পড়ে আছে, ভ্যালশফ তার বুক থেকে একটা লম্বা ছোরা টেনে তুলল। ছোরার বাঁটটা সে ন্যাকড়া দিয়ে ধরেছে। পেট্রফস্কি এবং আরও দু'-একজন লোক রয়েছে। সকলে এখন ফিসফিস করে কথা বলছে।

ওরা সকলে মরা লোকটাকে তুলে নিয়ে যেয়ে ওর বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ছোরাটা ভ্যালশফ আবার তার বুকে বিঁধিয়ে দিয়ে লোকটার ডান হাত দিয়ে ছোরাটার বাঁট ধরিয়ে দিল।

ভ্যালশফ আমাকে বলল, তোমাকে বলেছিলুম না যে তোমাকে খুন করা হবে? তাই সকালে লোকটা আমাদের ঘরে একা এসে ঢুকলে আমার সন্দেহ হল। কোনো গার্ড ওকে পৌঁছে দিয়ে গেল না। তবে এই শয়তানটাই কি ঘাতক। পেট্রফস্কি ও আমি পালা-

করে রাত জেগে ওর ওপর নজর রাখতে লাগলুম।

প্রথম রাত্রিটা পেট্রফস্কি জেগে পাহারা দিল। তারপর আমি জেগে রইলুম। ঘণ্টাখানেক পরে দেখি শয়তানটা উঠে বসল। তারপর কোমর থেকে না কোথা থেকে একটা ছোরা বার করল। ঐ ছোরাখানা। ছোরাখানা অন্ধকারে ঝলসে উঠল।

তারপর দেখি ব্যাটা শয়তান ছোরাখানা হাতে ধরে যতদূর সম্ভব কোমর বেঁকিয়ে নিচু হয়ে গুঁড়ি মেরে তোমার বিছানার দিকে এগিয়ে চলেছে। আমার সারা দেহ কেঁপে উঠল, রক্ত চঞ্চল হল। পেরফস্কিকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে আমি ওকে নিঃশব্দে অনুসরণ করলুম।

ব্যাটা যেই তোমার কাছে গিয়ে পৌঁছেছে আমি ওকে পিছন থেকে অতর্কিতে আক্রমণ করলুম। কিছু প্যাঁচ আমার জানা আছে। তারই সাহায্যে শয়তানটাকে আমি চিৎ করে ফেলতেই পেরফস্কি তার হাত থেকে ছোরাখানা ছিনিয়ে নিয়েছে। অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে ব্যাটা ঘাবড়ে গিয়েছিল। আমরা আর দেরি করলুম না। পেরফস্কির হাত থেকে ছোরাখানা ছিনিয়ে নিয়ে আর কথা নয়, সম্বন্ধীর বুকে ঠিক হার্টের ওপরে আমূল বসিয়ে দিলুম। পুরো কাজটা বোধহয় এক মিনিট লাগল। ব্যাটা চেঁচাবারও সুযোগ পায়নি।

পরদিন সকালে আমরা যেন কিছু জানি না। যে যার কাজে বেরিয়ে পড়লুম। পরে কোনো সময়ে রুশ গার্ডরা ওর সন্ধানে এসে ওর লাশ দেখে আত্মহত্যা সন্দেহ করেছিল।

এই ঘটনার পর থেকে আমরা চার ব্যাণ্ডেরস খুব সাবধানে রইলুম। কিন্তু ভ্যালসক করিৎকর্মা। ব্ল্যাটনয়দের সঙ্গে ও কি আলোচনা করল কে জানে কিন্তু "খুন করা হবে" তালিকা থেকে আমার নাম কাটা গেল।

ব্ল্যাটনয়দের নিয়মকানুন খুব কঠোর। কেউ কোনো নিয়ম ভঙ্গ করলে তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হয়। কতকগুলি নিয়ম একটু

অন্যরকম। কোনো ব্ল্যাটনয় কখনও কোনো জেলের ফটক খুলতে তো পারবেই না, বন্ধও করবে না। সে জেলখানার কোনো কিছু মেরামত করতে পারবে না, সে কোনো রক্ষীর কাছ থেকে খাদ্য চাইবে না, সে যদি কিছু চুরি করে তা ফেরত দিতে বাধ্য নয়। ব্রিগেডিয়ার পদমর্যাদার অধীন কোনো পদ সে গ্রহণ করবে না। সে তার সিনিয়র অফিসারদের আদেশ বিনা প্রতিবাদে পালন করতে বাধ্য।

একবার ক্যাম্পের কর্তারা চারজন ব্ল্যাটনয়কে সাধারণ কয়েদীদের মতো খনিতে কাজ করতে বাধ্য করেছিল। ব্ল্যাটনয়রা কাজ করতে গিয়েছিল বটে কিন্তু সেখানে তারা কয়েকজন গার্ডকে প্রহার করে রীতিমতো জখম করে দিয়েছিল। তাদের দেহের অনেক জায়গা কেটেকুটে গিয়েছিল। কমরেডদের কাছে এইসব ক্ষতচিহ্ন দেখালে তারা প্রশংসা অর্জন করে। এসব বিচিত্র নিয়ম।

প্রকাশ্যে দেখানো যায় শরীরের এমন অংশে ব্ল্যাটনয়রা উল্কি আঁকাত। উল্কির ছবিগুলি হত নগ্ননারীর বা নরনারীর রতিমিলনের দৃশ্য। এরা জুয়ো খেলত। জুয়ো খেলায় হার হলে তারা টাকা ধার পেত কিন্তু সে ধার শোধ করতে না পারলে তার মহাজন তাকে প্রহার করতে পারত। দুই হাত ব্যতীত শরীরের যে-কোন স্থানে মহাজন তার খাতককে প্রহার করতে পারত। লাঠি বা চাবুক দিয়েও মারতে পারত। এই ঋণশোধের ব্যাপার নিয়ে খুন পর্যন্ত হত কিন্তু তার বিচার হত না। বিশেষ পরিস্থিতিতে নরহত্যা মেনে নেওয়া হত।

ব্ল্যাটনয়রা ব্যাণ্ডেরসদের বিরুদ্ধে বা ব্যাণ্ডেরসরা ব্ল্যাটনয়দের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারত। ফলে ক্যাম্পে কি ঘটেছে তা কর্তারা জানতে পারত। ব্ল্যাটনয় ও ব্যাণ্ডেরসদের মধ্যে গুপ্তচর থাকত। গুপ্তচরদের মেয়াদ শেষ হলে তারা কখনই দেশে ফিরতে পারত না। তাদের হত্যা করা হত কারণ তারা অনেক বেশি জেনে গেছে।

ব্ল্যাটনয় থেকে যাদের বিতাড়িত করা হত তারাই সাধারণত

গুপ্তচরদের কাজ করত। তাদের বলা হত 'সুকা'। তাদের একটা রাইফেল দেওয়া হত এবং তারা গার্ডের কাজ করত।

এই রকম একজন সুকার নাম ছিল আইভান সোটরুকফ। লম্বা চওড়া দশাসই চেহারা, একটা দৈত্যবিশেষ। বেশ মোটা; দেহের পেশীগুলো ছিল আলগা, থলথল করত। ভুঁড়ির পরিধি তো দেখবার মতো ছিল। কান পর্যন্ত বিস্তৃত বেশ পুরু 'হ্যাণ্ডেলবার' গোঁফ ছিল। সে তার থাবার মতো হাত দিয়ে কোনো কয়েদীর ঘাড় ধরে তাকে মাটি থেকে তুলে ফেলত যেমন করে মানুষ বেড়াল ধরে তোলে। এই দৃশ্য দেখে অন্য ব্ল্যাটনয়রা হাসত।

একদিন সে এইরকম করে কয়েদীদের ঘাড় ধরে তুলে অশ্লীল গালাগাল দিচ্ছে তারপর সজোরে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। বেচারা কয়েদীরা অনাহারে বা ব্যাধিতে দুর্বল। আছাড় খেয়ে পড়ে জখম হত, কেউ হয়ত উঠতেই পারত না কেউ ধরে না তুললে।

সেদিন প্রচণ্ড শীত পড়েছে। শূন্য ডিগ্রির কত নিচে তাপমাত্রা নেমে গেছে কে জানে। বাইরে দাঁড়িয়ে আমি কাঁপছি। আমার সঙ্গে আরও হাজার দুই কয়েদী কাঁপছে।

আমাদের সকলেরই প্রচণ্ড ক্ষিধে পেয়েছে। একেই আমাদের অনাহারে রাখা হয়, যেটুকু আহার দেওয়া হয় তার মধ্যে পুষ্টিকর বিশেষ কিছু থাকে না তায় শীতের জন্যে ক্ষিধেও বাড়ে।

কখন ক্যান্টিনের দরজা খুলবে আমরা এই আশায় উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছি। আমাদের সঙ্গে সোটরুকফও অপেক্ষা করছে। সে সবার আগে দাঁড়িয়ে আছে।

এক সময়ে দরজা খুলল। আমরা সকলে হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকলুম। লাইন দেবার ব্যবস্থা কেন করা হয়নি জানি না। ক্যান্টিনে যারা খাবার দেয় তাদের মধ্যে একজনের সঙ্গে আমার একটু খাতির ছিল কিংবা বলা যায় সে ব্যাণ্ডেরসদের একটু খাতির করত।

আমি আমার ভাগের রুটি নেবার সময় সে আধখানা বাড়তি রুটি

হাত সাফাই করে আমাকে দিল। আমার আগে ছিল সেই দৈত্যটা। ব্যাটা ঠিক দেখতে পেয়েছে। রুটি নিয়ে আমি সবে ক্যান্টিনের বাইরে এসেছি। ও ব্যাটা আমাকে অনুসরণ করেছে। বাইরে বেরনোর সঙ্গে সঙ্গে ব্যাটা আমার পিছনে সজোরে লাথি মেরেছে।

লাথি খাওয়ার জন্যে আমি তো তৈরি ছিলুম না। মুখ থুবড়ে পড়লুম। ভাগ্যিস নরম তুষারের ওপর পড়লুম তাই বেশি আঘাত পাইনি। রুটির টুকরো দুটো ছিটকে পড়ল। আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালুম। আমি যে একদা কুস্তি লড়তুম, বক্সিং লড়তুম সে তো প্রায় ভুলেই গিয়েছিলুম, রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল।

দৈত্যটা যখন আমাকে আবার লাথি মারবার জন্যে পা তুলেছে। আমি চট করে তার পা ধরে মোচড় দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে পা মুচড়ে তার পিঠে দমাদ্দম করে লাথি চালাতে লাগলুম।

হাজার হোক দৈত্যটার গায়ে আমার চেয়েও জোর বেশি তাছাড়া দারুণ ঠাণ্ডায় আমার হাত পা প্রায় অবশ হয়েছিল। যে পরিমাণ জোরে তাকে আঘাত করছিলুম সেই পরিমাণে আঘাত তাকে লাগছিল না।

ব্যাটা উঠে দাঁড়াল। তার দাঁড়াবার ও হাত পা চালাবার ভঙ্গি দেখে বুঝলুম ব্যাটা গায়ের জোরেই মারামারি করে, কোনো প্যাঁচ বা কৌশল জানে না। সে দাঁড়াতেই আমি তার মুখে একটা ঘুঁসি বসিয়ে দিলুম। তার ঠোঁট কেটে গেল কিন্তু তাকে কাবু করল না। আমি যে তাকে আঘাত করতে পারি এটা বোধহয় সে আশা করে নি।

আমাকে একটা অশ্লীল গালাগাল দিয়ে মাথা নিচু করে ক্ষিপ্ত ষাঁড়ের মতো আমার দিকে তেড়ে এল। এ কায়দা আমি জানি। ঐ দৈত্য যদি তার মাথা দিয়ে আমার পেটে আঘাত করে তাহলে আমি গেছি।

আমি তৈরি হলুম। সে যত জোরে আমার দিকে তেড়ে এল আমিও তত জোরে আমার ডান হাঁটু দিয়ে তার মাথায় আঘাত করতেই সে চিৎ হয়ে উলটে পড়ে গেল আর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি তার মাথায় আমার বুট দিয়ে এত জোরে আঘাত করলুম যে তার মাথা ফেটে দু' ফাঁক। একটু ছটফট করেই সে নিশ্চল হয়ে গেল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই মৃত্যু। ফাটা মাথা থেকে রক্ত বেরিয়ে শাদা তুষার লাল হল।

মারামারির সময় কেউ বাধা দেয়নি। সকলে দাঁড়িয়ে দেখছিল। অনেকে চাইছিল দৈত্যটা মার খাক, তার শাস্তির প্রয়োজন, গায়ে জোর আছে বলে অনেককে মারধোর করে।

কেউ আমার রুটি তুলে রেখেছিল সে দুটো আমার হাতে সে তুলে দিল। আমি দৈত্যটাকে ফিরেও দেখলুম না, রুটি যার হাত থেকে নিলুম সে ইচ্ছে করলে রুটির টুকরো দুটো হাতিয়ে নিতে পারত। আর এই রুটির জন্যেই দৈত্যটাকে মরতে হল।

আমি আমার ব্যারাকে ফিরে যাবার সময় শুনতে পেলুম কেউ বলছে, ঠিক হয়েছে, ব্যাটা আমাদের অনেক জ্বালিয়েছে। আর একজন হাসতে হাসতে বলল, বাবারও বাবা আছে।

মহাযুদ্ধের সময় অনেক নিষ্ঠুর কাণ্ডকারখানা দেখে এবং এই লোকগুলো নিপীড়িত হওয়ার জন্যে তাদের মনের সুকুমার বৃত্তিগুলো একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে। একটা জলজ্যান্ত মানুষ যে একটু আগে বেঁচে ছিল এবং সে হঠাৎ নিহত হল এই ব্যাপারটা কারও মনে দাগ কাটল বলে মনে হল না। যেন একটা কুকুর বা বেড়াল গাড়ি চাপা পড়ে মরে গেল।

ব্যারাকে আমার ঘরে ঢুকে শুকনো রুটি চিবোতে চিবোতে ভাবতে লাগলুম এবার বোধহয় গার্ডরা এসে আমাকে ধরে নিয়ে যাবে। শাস্তি দেবে। পঁচিশ বছর মেয়াদ তো খাটছি, মারও অনেক খেয়েছি, সলিটারি সেলেও দিনের পর দিন কাটিয়েছি। মৃত্যুদণ্ড দেবে? তাই যেন দেয় তাহলে এই যমযন্ত্রণা থেকে উদ্ধার পাব। জীবন বড় বিচিত্র।

আমি সব ভুলে যেতে চাই। একটা মানুষকে এইমাত্র হত্যা করে এলুম কিন্তু একটুও অনুশোচনা হচ্ছে না। যাইহোক আমি আমার বাঙ্কে শুয়ে অপেক্ষা করতে লাগলুম।

ঘরের বাইরে অনেকের কথা শুনে উঠে বসলুম। ভ্যালসক, পেট্রফস্কি এবং আরও কয়েকজন এল। গার্ড আমাকে গ্রেফতার করতে আসেনি। আইভান সোটরুকফের সঙ্গে আমার মারামারিটা এরা সকলেই দেখেছিল।

ওরা ঘটনাটা আমার মুখ থেকে শুনল। আমার ভবিষ্যত ভেবে ওরা সবাই শঙ্কিত। আমার হাতের দুটো আঙুল ভেঙে গিয়েছিল। ওরা ব্যাণ্ডেজ করে দিল।

একটু পরেই দু'জন গার্ড এল। তারা আমাকে গ্রেফতার করল না, বলল, আমাদের সঙ্গে চল, ক্যাম্প কমাণ্ডাণ্ট ডাকছে।

আশ্চর্য ব্যাপার তো! নরহত্যার পরও আমাকে গ্রেফতার করল না? অথচ আমি যে অপরাধ করিনি সেজন্যে আমাকে মেয়াদ খাটতে হচ্ছে।

ঘরে ক্যাম্প কমাণ্ডাণ্ট ছাড়া আরও লোক ছিল। সকলে আমার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাইল। কমাণ্ডাণ্ট আমাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি হাতুড়ি দিয়ে ওকে আঘাত করেছিলে?

আমি বললুম, না, এই যে আমার ঘুঁসি দিয়ে, আমার দুটো আঙুল ভেঙেছে। বুট দিয়ে মেরে মাথা ফাটিয়েছি সেটা বললুম না।

আমি বাহাদুরি নেবার জন্যেই ঘুঁসির কথা বলেছিলুম। ওরা বোধহয় মনে মনে আমাকে হিরোর সম্মান দিয়েছিল। যে সম্মানই ওরা আমাকে দিয়ে থাকুক আমাকে ওরা ডিটেনশন সেলে নিয়ে যেতে বলল। যাবার আগে কেউ কেউ আমার পিঠ চাপড়াল, কেউ কেউ হ্যাণ্ডশেক করল। একজন তো বলেই ফেলল, আরে সোটরুকফ তো একটা রুশ ভাল্লুক, আমরা মনে করতুম ও অবধ্য, কোনো দিন মরবে

না, ওকে তুমি শুধু হাতে খতম করলে? সাবাস!

এখানে তাহলে নরহত্যা করেও বাহাদুর হওয়া যায়।

ডিটেনশন সেল থেকে আমাকে পরে আর একবার বার করে এনে ক্যাম্প কমাণ্ডাণ্টের সামনে দাঁড় করানো হল। তিনি বললেন, আইভ্যানকে হত্যা করার জন্যে আমার আরও দশ বছর দণ্ড হয়েছে। না, কোনো বিচার হয়নি। কর্তার শুধু মুখের কথাই বুঝি যথেষ্ট।

ডিটেনশন সেলে আমাকে একমাস রাখা হল, তারপর আবার আমাকে আমার ব্যারাকে ফিরিয়ে দেওয়া হল।

সেল থেকে আমি যখন ব্যারাকে যাচ্ছি তখন অনেকে টুপি তুলে অভিবাদন জানাল, ব্ল্যাটনয় সমেত কয়েকজন তো, স্যালুট করল। এক-জন ব্ল্যাটনয় বলল, 'টোভারিশ অ্যাঙ্গলিচ্যাল'—কমরেড ইংলিশম্যান।

এরপর যা কাণ্ডকারখানা হতে থাকল তা দেখেশুনে তো আমি রীতিমতো তাজ্জব। আমার পঁচিশ বছর মেয়াদ তো হয়েছিলই, তার ওপর আরও দশ বছর বাড়ল অথচ আমার প্রতি ভি-আই-পি-দের মতো ব্যবহার আরম্ভ হল।

ক্লোদিং স্টোরের একজন আরদালি আমার কাছে এসে প্রথমে গোড়ালির সঙ্গে গোড়ালি ঠেকিয়ে খটাস করে একটা স্যালুট দিল; তারপর সে যেন আমার ক্রীতদাস, এইরকম মোলায়েম স্বরে অত্যন্ত বিনীত স্বরে বলল, দয়া করে আপনি আমার সঙ্গে ক্লোদিং স্টোরে এসে আপনার পছন্দমতো পোশাক বেছে নিন।

আমি ফার লাইনিং দেওয়া কোট, তুলোর অস্তর দেওয়া গরম কাপড়ের ফুলপ্যাণ্ট, চামড়ার জ্যাকেট, হাঁটু পর্যন্ত টপ বুট আর কান পর্যন্ত ঢাকা পশমের পুরু টুপি বেছে নিলুম।

এগুলি নিয়ে আমি যখন আমার ব্যারাকে ফিরে আসছিলুম তখন ব্যারাকের সামনে আমারই জন্যে অপেক্ষমান আর একজন আরদালি বলল, অনুগ্রহ করে এদিকে আসুন।

'অনুগ্রহ করে', 'দয়া করে', 'প্লিজ' প্রভৃতি শব্দগুলো অনেকদিন

শুনিনি। তাই শব্দগুলো শুনে মনে হচ্ছিল এরা আমাকে বিদ্রূপ করছে না তো?

যাইহোক, আরদালি আমাকে যে ঘরে নিয়ে গেল সে ঘর দেখেও আমি অবাক। ব্যারাকে এমন সাজানো বেডরুমও আছে? খাটের ওপর গদি, তার ওপর তোশক, তোশকের ওপর উলের চাদর পাতা। মাথার দিকে বালিশ, পায়ের দিকে ভাঁজ করা পুরু কম্বল। আরে বাবা! এসব আমার সহ্য হলে বাঁচি!

দীর্ঘকায় একজন রাশিয়ান ঘরে এলেন। দেখেই বুঝলুম ইনি ভারি গুজনের একজন ব্ল্যাটনয়। তার গায়ে ধবধবে শাদা জ্যাকেট, পায়ে চকচকে গামবুট জানিয়ে দিচ্ছে ওর উচ্চ পদমর্যাদা।

কয়েকটা সোনার আংটিপরা হাত আমার দিকে প্রসারিত করল হ্যাণ্ডশেক করবার জন্যে। আমার হাত এত ময়লা ও নখ এত বড় যে হাত বাড়াতে আমি সংকুচিত হচ্ছিলুম।

অত্যন্ত বিনীতভাবে আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে ও রাশিয়ান কায়দায় আমাকে এরিক জর্জাভিচ প্লেজাণ্টস সম্বোধন করল। এরিক প্লেজাণ্টস আমার নাম। আমার পিতার নামের মাঝের শব্দটি জর্জ।

পদস্থ সেই ব্ল্যাটনয় বলল, আমার আসার উদ্দেশ্য হল তোমাকে অনুরোধ করা যে তুমি আমাদের দলে যোগ দাও। সে বলল, ব্ল্যাটনয় হলে তুমি কি সুযোগ পাবে তা বলার বোধহয় প্রয়োজন নেই। তাছাড়া তোমার প্রতি কিরকম আচরণ করা হবে তার কিছু পরিচয় তুমি ইতিমধ্যে পেয়েছ।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, আমার প্রতি এই সম্মান কেন?

সে বলল, ঐ যে সোটরুকফ? ও তো আমাদের 'টু বি কিলড' মানে হত্যা করার তালিকায় ছিল। ওকে গুলি করে মারার কথা ছিল। কারণ আমাদের ধারণা ছিল ওকে শুধু হাতে মারা যাবে না, একটা

গণ্ডার ছিল তো। কিন্তু তুমি শুধু ঘুঁসি মেরে ওকে খতম করেছ। তুমি বাহাদুর। যাইহোক, সে আমার উত্তরের জন্যে আবার ফিরে আসবে এবং নিশ্চয় আমার সম্মতি জানাব।

আমি পরে আমার ব্যাণ্ডেরস বন্ধু ভ্যালসফ ও পেট্রফস্কির সঙ্গে পরামর্শ করলুম, তোমরা কি বল। আমি ব্ল্যাটনয় হব কি?

দুজনেই গম্ভীর হয়ে গেল। ভ্যালসফ বলল, তুমি আমাদের বন্ধু এবং এখনও ব্যাণ্ডেরস, তোমাকে সোজা কথা বলছি শোনো। তুমি যদি ওদের দলে ভিড়ে না যাও তাহলে ওরা ধরে নেবে তুমি রুশ গুপ্তচর সংস্থা এন কে ভি ডি-এর স্পাই, তোমাকে ওরা মেরে ফেলবে। অতএব তোমাকে ব্ল্যাটনয় হতেই হবে। ব্ল্যাটনয় হলে ব্যাণ্ডেরসদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখা যাবে না। অতএব বন্ধু এইখানে বিদায়, গুডবাই অ্যাণ্ড গুডলাক, বলে ওরা দুজনে আমার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে চলে গেল।

পরদিন একজন ব্ল্যাটনয় ব্রিগেডিয়ার আমার কাছে এল। টুপি স্পর্শ করে বলল, আমাদের একটা পার্টি খনিতে যাচ্ছে, তুমিও চল।

আমি যখন তার সঙ্গে যাচ্ছি তখন পথে কয়েকজন গার্ডের সঙ্গে দেখা। এদের মধ্যে এখন দু'একজনকে আমি চিনতে পারলুম। এরা আমাকে প্রহার করেছিল। কিন্তু এখন দেখলুম তারা আমাকে সসম্মানে স্যালুট করছে! বাঃ বেশ মজা! রাতারাতি কি পরিবর্তন!

আপাতত আমাকে একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে কয়েকজন সুসজ্জিত ব্ল্যাটনয় রয়েছে। তারা সকলে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে অভিবাদন জানাল।

তারা জানতে চাইল সোটরুকফকে কি করে মারলুম, একটু দেখিয়ে দাও তো কমরেড ইংলিশম্যান।

আমি যে বুট দিয়ে তার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলুম সেটা স্রেফ

চেপে গেলুম। উলটে দেখালুম কিভাবে প্যাঁচ কসে তাকে ঘায়েল করে স্রেফ ঘুসির জোরে প্রথমে তার মুখের চেহারা খারাপ করে দিলুম, তার মাথা দু'ফাঁক করে, এই যে এই ঘুঁসি।

দাড়িওয়ালা ছোটখাটো একজন মানুষ তার নীল চোখ নাচিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, যুদ্ধে আসার আগে তুমি কি করতে কমরেড।

আমি বললুম, আমার কাজ ছিল স্রেফ মারামারি করা। ব্যাংক লুট তো করেইছি, কেউ ভাড়া করে নিয়ে গেলে তার বা তাদের হয়ে মারামারি করেছি, বনেদি বাড়ির অনেক বৌ ফুঁসলে এনেছি। মজার কথা কি লেডিরা আমাকে ছাড়তে চাইত না, তারাই আমাকে খাওয়াতো পরাতো। সে এক জীবন ছিল। বলা বাহুল্য অনেক ঘটনা বাড়িয়ে বলেছি।

দাড়িওয়ালা নীল-চোখো আমাকে বলল, এখানে তুমি আর কিছু পাও না পাও মেয়ে পাবে, তাদের মধ্যে কয়েকজন তো তোমার মতো অ্যামাজন মেয়ে বলতে পার। সে কথা যাক এখন তোমার বাবার নামে দিব্যি করে বল তো যে তুমি আমাদের দলে আসছ, সব নিয়ম মেনে চলবে, দল ছেড়ে কখনও যাবে না।

তারপর সে সমবেত সকলকে জিজ্ঞাসা করল, এরিক জর্জাভিচ আমাদের দলে এলে তোমাদের কারও আপত্তি নেই তো?

সকলে সমস্বরে জানাল তাদের আপত্তি নেই। এরকম একটা লোক দলে থাকা দরকার।

আমি দলে ভর্তি হয়ে গেলুম। আমি ব্ল্যাটনয় হলুম। দলভুক্তি পাকা করবার জন্যে সকলে মিলে ভোদকা পান করা গেল। ইস্, কতদিন পরে পেটে সুরা পড়ল। এবার আমার আশা হল আমি আমার স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরে পাব।

ওরা একটি ছোকরাকে আমার সঙ্গে ভিড়িয়ে দিল। বলল সে আমার টিউটর ও গাইড ব্ল্যাটিনয় রীতিনীতি শেখাবে, কিছু কাজকর্মও

করে দেবে কিন্তু আসলে বুঝলুম সে একটা স্পাই, আমার ওপর নজর রাখা তার কাজ।

ব্ল্যাটনয় হবার কিছুদিন পরে আমাকে আমাদের ক্যাম্প থেকে অন্যান্য ব্ল্যাটনয় ও কয়েকজন গার্ডের সঙ্গে একটু দূরে একটা বনে পাঠানো হল। সেখানে কিছু নির্মাণ কাজ চলছিল। আমরা সেসব তদারক করব। কিছু বন্দী কাজ করছিল। আমার সঙ্গে আমার টিউটর ও গাইড বেশ সাজগোজ করে এসেছিল। ওর নাম ভাসা।

ভাসা আমাকে ও কয়েকজন ব্ল্যাটনয়কে একজায়গায় বসিয়ে রেখে কোথায় গেল। গাছের কাটা গুঁড়ির ওপর চেরা তক্তা ফেলে বসবার জন্যে বেঞ্চি করা হয়েছে। কয়েকটা কাটা গুঁড়িও রয়েছে। তার ওপরও বসা যায়। বনের গাছগুলো বড় সুন্দর। লম্বা লম্বা গাছ। বেশি ডাল নেই। পাতার নানা রং। গাছের গোড়ায় ছোটখাটো গুল্ম বা ঘাস আছে।

মেয়েরা খিল খিল করে হাসতে হাসতে যখন এ ওর গায়ে পড়ে, ঠিক সেইরকম হাসির শব্দ শুনে আমি একটু অবাক হয়ে চাইতে লাগলুম।

এমন হাসির শব্দ কোথা থেকে আসছে? হাসি ক্রমশ আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। যখন হাসি বেশ কাছে এগিয়ে এল তখন গাছের ফাঁক দিয়ে একপাল যুবতীকে দেখা গেল। হেলতে দুলতে এ ওর গায়ে ঢলে পড়তে পড়তে আমাদের দিকেই আসছে। সবার পিছনে ভাসা নামে সেই ছোকরা যে আমার টিউটর ও গাইড।

সবার আগে যে যুবতী আসছে তার দিক থেকে চোখ সরিয়ে নেওয়া অসম্ভব। অ্যামাজন মেয়ের মতো চেহারা।

কিংবদন্তী কাহিনীর অ্যামাজনের মেয়েরা ঘোড়ায় চেপে যুদ্ধ করত, তলোয়ার চালাবার সুবিধের জন্যে ডান দিকের স্তন কেটে বাদ দিত— এইরকমই শোনা যায়।

কিন্তু এই মেয়ের দুটি স্তনই আছে। সকলের পরনে ফুলপ্যাণ্ট, পায়ে প্রায় হাঁটু পর্যন্তবুট, গায়ে উজ্জ্বল রঙের ব্লাউসের শিপস্কিন জ্যাকেট। সেই জ্যাকেট এই মেয়ের উদ্ধত দুই স্তনকে ম্লান করতে পারেনি বরং বুক দুটি পোষা পায়রার মতন যেন জ্যাকেট থেকে মুক্ত হবার জন্যে ছটফট করছে। দু'তিনটি মেয়ে প্যাণ্টের বদলে স্কার্ট পরেছে।

অ্যামাজন মেয়েটি বেশ লম্বা, ভাসার চেয়েও। মাপা ফিগার। বুকের মাপ যদি হয় আটত্রিশ তো নিতম্বও আটত্রিশ। জ্যাকেটের জন্যে কোমর কতটা সরু বোঝা যাচ্ছে না, সরু বলেই তো মনে হচ্ছে।

অ্যামাজন সুন্দরী তার দু হাত দিয়ে আমার মুখ তুলে ধরে আমার ঠোঁটে তার ঠোঁট চেপে ধরল। ওঃ সে কি চুম্বন। কখনও ভুলব না। চুম্বন শেষ করে আমাকে বেঞ্চিতে শুইয়ে দিল।

সে মেয়ে তখন উদ্দাম।

আমি বললুম তোমার সবকিছু এখন উজাড় করে ফেলো না, একটু বাকি রাখ। সেটুকু আমার ঘরের জন্যে থাক।

তাহলে তোমার ঘরে চল। আমি নিজেকে বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারব না।

আমি এবং ও উঠে বসলুম। জিজ্ঞাসা করলুম তোমার নাম কি?

ক্যাটুশা, তোমার?

এরিক।

এদিকে মেয়ের দল এক একজন ব্ল্যাটনয়কে পাকড়াও করেছে। কেউ কাউকে ধরে নাচছে, কেউ কোনো মেয়েকে পিঠে তুলে নিয়েছে, কেউ কাউকে সাপটে ধরে চুমো খাচ্ছে আবার একটা ছেলে একটা মেয়েকে ধরে গাছের আড়ালে চলে গেল। অবাধ লীলাখেলা বেশ কিছুক্ষণ চলল। তা ঘণ্টা দুই হবে।

করুণা হচ্ছিল দূরে কর্মরত শ্রমিক ও গার্ডদের দেখে। তারা মাঝে-মাঝে আমাদের দিকে চেয়ে দেখছিল। মেয়েমানুষ দেখা দূরের কথা, মেয়েমানুষের গায়ের গন্ধই কতদিন পায়নি। বেচারারা সত্যিই করুণার পাত্র! এ যেন ক্ষুধার্তর সামনে কেউ পেটভরে আহার করছে। সব চেটেপুটে খেয়ে ফেলল। অভুক্তর জন্যে কিছুই রাখল না।

মেয়ের দল এবার তাদের ক্যাম্পে ফিরে যাবে কিন্তু সেই অ্যামাজন মেয়ে যে তার নাম বলল ক্যাটুশা সে আর দুটো মেয়ে থেকে গেল। এই মেয়ে দুটির চেহারা ক্যাটুশার মতো লম্বাচাওড়া না হলেও বেশ ভাল। যাকে বলে নকআউট ফিগার।

ক্যাটুশা হাসতে হাসতে আমাকে বলল, লাভারবয়, তুমি আমাকে সুখ তো দেবেই আমার এই দুই প্রিয়বান্ধবীকেও দিতে হবে।

আমি কি স্বপ্ন দেখছি, নাকি আরব্য রজনীর আলাদিনের সেই দৈত্য আমাকে কোনো পরীরাজ্যে নিয়ে এসেছে? এইতো মাত্র কয়েকদিন আগে সলিটারি সেলে খালি মেঝেতে পড়েছিলুম, মার খেয়ে প্রাণ যাচ্ছিল, তারপর লেবার ক্যাম্পে বদলি, তারপর মানুষ খুন করে মেয়াদ বাড়ল এবং সেইসঙ্গে নরক থেকে স্বর্গরাজ্যে বদলি, ভালো পোশাক, ভালো খাওয়া, বিনা কাজ এবং সুন্দরী যুবতী উপভোগ। কি আশ্চর্য!

মেয়েদুটি তো তখনি আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমাকে ছিঁড়ে খাবে বোধহয়। আমি নিজেকে আটকাতে পারছি না।

ক্যাটুশা অদ্ভুত ভাষায় তাদের কি বলতে তারা আমাকে ছেড়ে দিল, তারপর ক্যাটুশা আমার কাছে এসে বলে গেল আমরা এখন যাচ্ছি, সন্ধ্যায় আসব, তৈরি থেকো।

সন্ধ্যা হতে না হতেই জোরে হাওয়া বইতে লাগল, তুষারপাত আরম্ভ হল। আমি ব্যারাকে আমার ঘরে খাটের ওপর বসে ভাবছি মেয়েগুলো বোধহয় আসতে পারবে না, যদি এসে পড়তে পারে তো ভালই হয়। আমার ঘরে স্টোভে আগুন জ্বলছে। ঘর মোটামুটি গরম

আছে। গোটাকতক খালি বোতল যোগাড় করে গরম জল ভরে বিছানায় রেখে কম্বল ঢাকা দিয়ে দিয়েছি, বিছানাটা বেশ গরম আছে। গরম জলেরও ব্যবস্থা আছে।

আমাকে চমকে দিয়ে দরজায় ধাক্কা, একসঙ্গে অনেকজনের। দরজা খুলতেই একঝলক ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে হুড়মুড় করে তিনটে মেয়ে দমকা বাতাসের মতোই ঘরে ঢুকে পড়ল।

তিনজনের গায়ে লম্বা রুলওয়ালা চামড়ার কোট ছিল। মাথায় ছিল পুরো মুখঢাকা পুরু পশমের টুপি, হাতে দস্তানা, পায়ে টপ বুট। সকলে আগে কোট আর জুতো খুলে দেওয়ালে ঝুলিয়ে দিল। জামা-গুলোর ওপর তুষার আটকে ছিল। দস্তানা আর জুতোও খুলে ফেলল, তারপর চামড়ার জ্যাকেট খুলল। তার নিচে ছিল উলের সোয়েটার। তিনজনে স্টোভ ঘিরে হাত পা সেঁকে নিয়ে আমার ওপর একসঙ্গেই ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মেঝেতে কম্বল বিছানো ছিল। আমি কম্বলে বসে ওদের দেখছিলুম। ভাবছিলুম আমার অ্যানালিসার কথা। এখন কোথায় আছে কে জানে, শীতে কষ্ট পাচ্ছে কিনা, খেতে পাচ্ছে কিনা এসবও যেমন ভাবছিলুম তেমনি এই মেয়ে তিনটের কথাও ভাবছিলুম।

অ্যানালিসা কিন্তু এই ছুঁড়িগুলোর মতো এত উচ্ছল নয়। এদের দোষ দেওয়া যায় না। এরা কতদিন উপবাসী আছে, পুরুষ দেখলেও তাদের স্পর্শ করবার সুযোগ পায়নি। এই মুহূর্তে অ্যানা যদি এখানে আসে তাহলে সেও বোধহয় এমনিভাবেই আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ক্যাটুশা সত্যিই অ্যামাজন। আমাকে ছাড়তে চায় না। খেতে পাই না পাই আমি কিন্তু প্রতিদিন ব্যায়াম করতুম। সলিটারি সেলে তেমন সুযোগ হত না তবুও বৈঠক করতুম। বাইরে এসে তো ভালো করেই ব্যায়াম করেছি, তাই এদের সামলাতে পারছি।

হইহুল্লোড় আর হাসিতামাশায় রাত্রি কেটে গেল। কাঁচের

জানালার বাইরে বরফ জমেছে, বাইরে কিছু দেখা যাচ্ছে না।

একজন মেয়ে বলল, এই সকাল হয়ে গেছে রে, চল চল নইলে ব্রেকফাস্ট জুটবে না। ওরা গরম জলে হাত মুখ ধুয়ে কোট, জুতো ও দস্তানা পরে নিল। আবার আসব নয়ত তোমাকে নিয়ে যাব বলে ওরা চলে গেল। বাইরে হাওয়া ও তুষারপাত বন্ধ হয়েছে।

কাল সকাল আর সারা রাত্রিটা বেশ কাটল। শুনলুম গত কাল রাত্রে শীত নাকি শূন্য ডিগ্রির নিচে তিরিশ ডিগ্রি নেমে গিয়েছিল কিন্তু আমার ঘরে কাল রাতে তাপ ছিল শূন্যর ওপরে পঞ্চাশ ডিগ্রি। তাহলেই বোঝা যাচ্ছে রাত্রিটা কেমনভাবে আমরা চারজনে উপভোগ করেছিলুম। ওরা আবার কখন আসবে?

কয়েকদিন পরে।

সন্ধ্যার সময় বসে মনে মনে ভাবছি ক্যাটুশা যদি আসে তো বেশ হয়। এর মধ্যে দু'একদিন রাত্রে গার্ডদের চোখ এড়িয়ে ও আমার কাছে এসেছিল। এমন সময় আমার ডাক পড়ল। একজন গার্ড এসে আমার হাতে একখানা জরুরী চিঠি ধরিয়ে দিল।

চিঠির মাথায় লাল পেনসিলে লেখা আর্জেন্ট। কি ব্যাপারে রে বাবা! ব্ল্যাটনয়দের বিশেষ মিটিং, গার্ডের সঙ্গে চলে এস। গায়ে কোট চাপিয়ে, গলায় মাফলার জড়িয়ে, টপ, বুট, মাথায় কানঢাকা টুপি পরে গার্ডের সঙ্গে চললুম।

ক্যাটুশা আমার কাছে লুকিয়ে এসেছিল কেন? তার কৈফিয়ৎ দাবি করা হবে নাকি?

মিটিং হলে ঢুকে দেখলুম সাত আটজন বাছা বাছা ব্ল্যাটনয় বসে আছে। ব্যাপারটা জরুরী নাকি? ওদের মুখ দেখে তো তা মনে হচ্ছে না।

আমাকে বসতে বলা হল। বসলুম। শুনলুম একটি চোরের বিচার হবে। চোর মানে একজন 'সুকা' ইনফরমার। বিচারক একজন রয়েছেন,

শ্বেত কেশ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, দাড়ি গোঁফ নেই কিন্তু চেহারাটি কুটনীতিকের মতো।

চোর কিন্তু সেখানে উপস্থিত নেই। সে তার নিজের ঘরে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে বসে আছে। বিচারের সময় হাজির না থাকলেও এত ভালো বিচার অর্থাৎ সুবিচার সে আশা করতে পারে না।

সাক্ষীরা অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছে সে গোপনে এন কে ভি ডি-এর হয়ে ব্ল্যাটনয়দের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। শাস্তি প্রাণদণ্ড। দুজন পোলকেও সে ফাঁসিয়েছে।

প্রাণদণ্ড কিভাবে দেওয়া হবে? বধ্যভূমিতে এনে গলা কাটা হবে? ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে হাত পা বেঁধে চোখে কালো রুমাল বেঁধে গুলি করে মারা হবে? নাকি গাছের ডাল থেকে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেওয়া হবে?

না, ওসব কিছু নয়। ব্ল্যাটনয়দের আলাদা নিয়ম আছে। বিচার হয়ে গেছে। প্রাণদণ্ড দেওয়াও হয়ে গেছে। ঘাতক এখনও ঠিক হয়-নি। ব্ল্যাটনয়দের ভেতর থেকেই একজনকে ঘাতক ঠিক করা হবে। কি করে ঠিক করা হবে?

এখনি চারজন কার্ড টেবিলে বসে তাস খেলবে। যে হারবে সেই হবে ঘাতক। ওরা ভালো করেই জানে আমি অনেক কিছু জানলেও তাস খেলা একদম জানি না। অতএব খেলতে বসে আমি হারলুম। আমিই ঘাতক। একজন আমার হাতে বেশ ধারালো ও বেশ বড় একখানা ছোরা দিতে চাইল। আমি বললুম, থাক। গলা বা ঘাড়ের কোথায় টিপলে বা আঘাত করলে মানুষ মারা যায় তা আমি উত্তমরূপে জানি।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, আমার শিকার কোথায় আছে?

একজন, কে তা আমি এখন মনে করতে পারছি না, সে বলল, ঐ যে ঐ সাত নম্বর কুঁড়েতে থাকে। লোকটা জার্মান। খনিতে ওভার-সিয়ারের কাজ করত, সাত নম্বর কুঁড়েতে দুজন পোলের সঙ্গে থাকত;

ওরা ওভারসিয়ার ছিল। লোকটা পাজি, শয়তান। সে একজন ব্ল্যাটনয় ও তার দুজন পোল রুমমেটের বিরুদ্ধে মিথ্যা নালিশ করে ধরা পড়ে গেছে। প্রথমে তো অভিযোগ সত্যি মনে করে ওকে খনির কাজ থেকে অব্যাহতি দিয়ে ক্যান্টিনে ভালো কাজ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সেখানে চুরি করতে আরম্ভ করায় ধরা পড়ে যায় এবং তার আগেকার নালিশও মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয় তখন তার এই বিচার হল তা তো তুমি সব শুনলে ও দেখলে।

শয়তানটা এখন কোথায়? সলিটারির সেলে আটক করে রাখা হয়েছে?

না, সে তার সাত নম্বর কুঁড়েতে আছে, ব্যাটা সবসময়ে দরজা বন্ধ করে রাখে। দরজা খুলতে চায় না। এজন্যে কাল থেকে তার খাবার বন্ধ। ব্যাটার হাতে সবসময়ে একটা কুড়ল থাকে, ছোরাও একখানা থাকে।

আমি বললুম, লোকটা দরজা না খুললে তো দরজা ভাঙতে হবে নাকি? কিন্তু দরজা তো বেশ মজবুত।

সে বলল, ব্যাটার একটা গার্ল আছে, সোফিয়া, দেখ তার নাম করে কিছু করতে পার কিনা।

আমি বললুম, গ্র্যাণ্ড, আমি এখনি যাচ্ছি, আমি ঠিক ব্যবস্থা করে নোব।

ব্ল্যাটনয় হয়ে পর্যন্ত আমার খাওয়া-দাওয়া ভালোই হচ্ছিল। রোজ একসারসাইজ আর জিমন্যাস্টিক অভ্যাস করছিলুম। গায়ের জোর ফিরে পেয়েছিলুম, পেশীগুলোও সাবলীল হয়েছিল।

বাইরে তখন সোঁ সোঁ করে বেশ জোরে হাওয়া দিচ্ছে, উড়ছে। শরীর আর হাত যাতে ঠাণ্ডায় অবশ না হয়ে যায় এজন্যে শরীর বেশ করে আবৃত করে নিলুম, হাতে চামড়ার গ্লাভস পরলুম।

আমার কিন্তু আসল শক্তি হল সাহস। পনেরো মিনিটের মধ্যে ফিরে আসছি, বলে বেরিয়ে পড়লুম।

সাত নম্বর কুটিরের দরজা জানালা বন্ধ। আমি দরজায় ইচ্ছে করে আস্তে ধাক্কা দিলুম।

ভেতর থেকে আসামী বলল, কে রে বেজন্মা, দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিস? গরম কফি এনেছিস?

না, আমি বন্ধু, দরজাটা একটু খোল, সোফিয়া একটা মেসেজ দিয়েছে।

একটু দাঁড়াও দরজা খুলছি।

লোকটা প্রথমে দরজা একটু ফাঁক করে বলল, কই? কি মেসেজ?

আমি সজোরে দরজায় ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকেই কড়া চামড়ার দস্তানা পরা হাত দিয়ে যতদূর সম্ভব ওর ঘাড় ধরে সামনের দিকে বেঁকিয়ে দিলুম, এত জোরে যে ওর গলার হাড় ভেঙে গলা লল-লল করতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে চোখ উলটে জিভ বার করে মৃত্যু। লাশটা মেঝেতে ফেলে রেখে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে এলুম। আসবার সময় ওর কুড়ুল আর ছোরাটা এনে ব্ল্যাটনয় অফিসারদের সামনে ফেলে দিলুম।

একজন ব্ল্যাটনয় বলল, সাবাস। তারপর একজন গার্ডকে উদ্দেশ করে বলল, যা ওকে পুঁতে দিয়ে আয়, জমির ভালো সার হবে।

মৃত জার্মানটার বয়স চল্লিশ হবে। গায়ে জোর ছিল মনে হয়েছিল, বেশ হৃষ্টপুষ্ট। ওর আর কফি খাওয়া হল না। তবে ক্যাম্পে কফি বলে যা দেওয়া হয় তাতে কি কফি থাকে?

একজন গার্ড বলল, কমরেড ডাক্তারকে বডি দেখাবেন না? ডাক্তারের রিপোর্ট না পেলে মস্কো হাঙ্গামা করবে। আমরাও বিপদে পড়ব।

যথাসময়ে ডাক্তার এসে মৃতদেহ দেখল। নিয়মমাফিক বুকে একবার স্টেথস্কোপ বসালো, নাড়ি টিপল। সার্টিফিকেট লিখে দিল, হার্টফেল করে মারা গেছে। হার্ট চালু থাকতে মানুষ যেন মারা যায়!

আমার খাতির বেড়ে গেল। লোকটা শুধু হাতেই মানুষ মারতে পারে। যে-সে লোক নয়।

সেদিন বিকেলে আমার সম্মানে ছোটখাটো একটা পার্টি দেওয়া হল। পানাহার বেশ ভালোই হল। সেদিন রাত্রে ডিনারটাও ভালোই হয়েছিল। প্রচুর মাংস আর রুটি ছিল। বেশ পেট ভরে খাওয়া গেল।

আমার ঘরে ফিরে স্টোভের আগুন বাড়িয়ে দিয়ে শোবার উপক্রম করছি। দরজায় টোকা।

দরজা খুলতেই আপাদমস্তক আবৃত, খিল খিল করে হাসতে হাসতে দুই যুবতীর প্রবেশ। ইস বাইরে কি ঠাণ্ডারে বাবা। একটু গরমের আশায় এসেছি।

তারা স্টোভের ধারে কিছুক্ষণ বসে শরীর একটু গরম করে টুপি, ভারি কোট, জুতো, মোজা খুলে শরীরটা আর একটু গরম করে নিল। একটা মেয়ের নাম মে, অপরটার নাম হেদার, দুটোই জার্মান মেয়ে।

দুজনে প্রথমে সিগারেট বার করল। সিগারেট কোথা থেকে পেল? যাইহোক আমাকেও একটা দিল। তিনজনেই সিগারেট ধরালুম। ব্যারাকে কিন্তু ধূমপান নিষিদ্ধ, অনেকদিন পরে সিগারেট টানতে বেশ ভালই লাগল।

মে নামে একটি মেয়ে আমাকে একটা মাফলার আর অপর মেয়ে হেদার আমাকে উলের একটা আণ্ডারওয়ার দিল। নিজের হাতে বোনা কিছু উপহার দেওয়ার উদ্দেশ্য হল আমাকেও কিছু দাও। কিছু মানে, কোনো সামগ্রী নয়। আমাকে উপভোগ কর। সেইজন্যেই তারা এসেছে এবং আমিও তাই চাই কিন্তু একটা অসুবিধে আছে, মন খুঁত খুঁত করে। যা ঠাণ্ডা!

মেয়েদুটি নতুন। এই বোধহয় তাদের প্রথম অভিজ্ঞতা সেজন্য আমাকে সতর্ক হতে হল। তাহলেও মেয়েদুটোর স্বাস্থ্য ভালো ও কষ্টসহিষ্ণু।

এক ঘণ্টা দারুণ কাটল, যাকে বলে চরম আনন্দ। হাঁপিয়ে গিয়েছিলুম। এমন সময় দরজায় ধাক্কা, বেশ জোরে। কেরে বাবা?

দরজা খুলতেই ক্যাটুশা ঘরে ঢুকে মে আর হেদারকে মারে আর কি, তোদের বড় আস্পর্ধা হয়েছে নয়? আমারই ভুল। এরিকের কথা তোদের বলা আমার ঠিক হয়নি। যাক গে যা করেছিস বেশ করেছিস, এই ঠাণ্ডায় আর ক্যাম্পে ফিরতে হবে না। ঐ ত আর একটা খাট রয়েছে, ঐটেতে দুজনে শুয়ে জুলজুল করে দেখ আমি এরিককে কি করি তোদের শরীর গরম হবে, শীত করবে না, তবে দেখিস তোরা দুজনে মিলে যেন কিছু করিস না।

সত্যি মেয়ে যদি উপভোগ করতে হয় তো ক্যাটুশার মতো। আনন্দ দেওয়া নানা পদ্ধতি ক্যাটুশার জানা আছে। আমি ক্যাটুশাকে বললুম, ক্যাটুশা আমরা যদি কখনও এই ক্যাম্প থেকে বেরোতে পারি তাহলে আমি তোমাকে আমার বৌ অ্যানালিসার সঙ্গে ভাব করিয়ে দোব, তুমি তাকে তোমার এই কৌশল শিখিয়ে দেবে তো?

তোমার বৌ বলেই শেখাব। কারণ তুমি আমাকে যে তৃপ্তি দিতে পেরেছ এমন আর কেউ পারেনি।

আমি বলি, ক্যাটুশা তুমিও, তোমাকে একবার কাছে পেলে ছাড়তে ইচ্ছা করে না। বিপরীত বিহারেও তুমি দেখছি পুরুষের মতো পারঙ্গম।

কেন হব না? আমি যে অ্যামাজন।

আমার ঘরে বন্দিনী যুবতীর উৎপাত ক্রমশ বাড়তে লাগল। স্বীকার করি আমার দেহে শক্তি আছে। এক হাজার ডন টানতে পারি। এক হাজার বৈঠক দিতে পারি, শুধু হাতে অবলীলায় মানুষ মারতে পারি, পেটের ওপর লোহার ভারি গোলা ফেলতে পারি, গলায় ফাঁস আটকে আমাকে কেউ মারতে পারে না; তাহলেও একদিন

একাদিক্রমে কতজন জওয়ানী মেয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করা যায়, বিশেষ করে যাদের অল্পে তৃপ্ত করা যায় না।

আমি তখন এক কৌশল আরম্ভ করলুম। যে মেয়েগুলি আমার কাছে আসত তারা সকলেই আমার ওপর ভাগ বসাবার জন্যে ব্যগ্র থাকত। সকলে ভাবত, আমি তাকেই বেশি পছন্দ করি তার পালা সবার আগে।

একদিন আমি কোনো বিচার না করে বা কিছু না ভেবে যাকে ইচ্ছে ডাকতে লাগলুম। ব্যস, লেগে গেল। আমার ওপর রাগ করা দূরের কথা মেয়েরা আমাকে আগে পাকড়াও করবার জন্যে নিজেদের মধ্যে মারামারি আরম্ভ করে দিল।

সে এক বীভৎস কাণ্ড। অনেক মেয়ে তো প্রায় অর্ধনগ্ন হয়েই ছিল, এখন মারামারির ফলে সকলেরই পরিচ্ছদ ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে গেল। অ্যামাজন ক্যাটুশার সঙ্গে কেউ পারল না, সে তো দু'তিনজনকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে ঘর থেকে বাইরে ঠাণ্ডায় বার করে দেয় আর কি।

কথাটা ক্যাম্প কমাণ্ডাণ্টের কানে উঠেছিল। তিনি কাউকে শাস্তি দিলেন না তবে আপাতত তাদের ক্যাম্প থেকে বাইরে বেরোন নিষিদ্ধ করে দিলেন। রাত্রে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করে দিলেন।

আমিও দেখলুম যথেষ্ট হয়েছে। দিনকতক বিশ্রাম নেওয়া যাক।

কয়েকটা দিন বেশ ভালোমন্দয় কেটে গেল। মাঝে মাঝে এদের আমি খেলা দেখিয়ে আনন্দ বিতরণ ও একঘেঁয়েমি কাটাবার চেষ্টা করি। সকলেই তো দেখি খেলা বেশ উপভোগ করে কিন্তু এদের মানসিক কোন পরিবর্তন আনতে পারি না। বন্দীদের প্রতি ওদের নিষ্ঠুরতা একটুও কমে না।

আমি যখন ক্যাম্পে প্রথম আসি তখন লক্ষ্য করেছিলুম যে বন্দীদের মধ্যে সদ্ভাব আছে, বাণ্ডেরসদের মধ্যে একতা আছে কিন্তু তখন কর্তারা

সকলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছে। ব্যাণ্ডেরসদের মধ্যে বিশেষ কিছু করতে পারেনি। তারা নিজেদের মধ্যে মাঝে মাঝে ঝগড়া করলেও ব্ল্যাটনয়দের বিরুদ্ধে কিন্তু এক।

ক্রমশ অবস্থা এমন দাঁড়াল যে ব্ল্যাটনয়দের সঙ্গে ব্যাণ্ডেরসদের মধ্যে বুঝি মারামারি লেগে যায়। আমি ভ্যালসফকে বোঝাবার চেষ্টা করি, বলি বাপু হে, ব্ল্যাটনয়দের সঙ্গে মারামারি কোরো না তাহলে ক্যাম্প কমাণ্ডাণ্ট ব্ল্যাটনয়দের পক্ষ নিয়ে তোমাদের কচুকাটা করবে!

এদিকে আমার বিপদ হল। এই যে আমি দু-দলে মিটমাট করবার চেষ্টা করছি এটা ক্যাম্প কমাণ্ডাণ্ট ভালো চোখে দেখল না। সে ভাবল আমি ব্যাণ্ডেরসদের দলে আবার ফিরে গেছি।

শীত কমেছে। আকাশ পরিষ্কার থাকলে এক একদিন দুপুরে বেশ গরম করে। এইরকম একদিন দুপুরে সমস্ত বন্দীকে মায় ব্যাণ্ডেরসদের শুদ্ধ বাইরে মাঠে এনে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে সার সার দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। উদ্দেশ্য, দেখা যে কারও শরীরে কোনো অস্ত্র লুকনো আছে কিনা। কয়েকজনের কাছে ছোরা পাওয়া গেল, কয়েকজনের কাছে ছোট হাতুড়ি। কয়েকজন লোহার পাত ঘসে ধারাল অস্ত্র তৈরী করেছে। এদের সকলকে তো তখনি বেত মারা হল ও তারপর সলিটারি সেলে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

ওদিকে আর একদল ব্যারাক সার্চ করে কয়েকটা কুড়ুল ও লোহার রড পেয়েছিল। যারা খনিতে কাজ করে বা গাছ কাটতে যায় তারাই বোধহয় এইসব অস্ত্র সংগ্রহ করে লুকিয়ে রেখেছিল।

সেদিন সকলকেই শাস্তি দেওয়া হল। বিকেলে ও রাতে কাউকে খেতে দেওয়া হল না। আমাকেও শাস্তি দেওয়া হল। ব্ল্যাটনয়দের তালিকা থেকে আমার নাম সাময়িকভাবে কেটে আমাকে ব্যারাকে ফিরিয়ে দেওয়া হল এবং আবার খনিতে কাজ করতে দেবার আদেশ দেওয়া হল।

কি আর করা যাবে। ব্ল্যাটনয় হই আর যাই হই আমি তো বন্দী। সবই মেনে নিতে হবে।

একদিন খনিতে কাজ করছি এমন সময় আর একজন বন্দী আমার কানে ফিসফিস করে বলল, 'সাবধানে থেকো, আজ বা কাল রাত্রে ব্যারাকে রায়ট হবে।'

লোকটি জার্মান। নাম বলল অটো, সে গ্যাস ইনস্পেক্টর। সারা খনিতে তাকে যন্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়। কোথায় গ্যাস জমে তাকে খুঁজে বার করতে হয় এবং সতর্ক করে দিতে হয়।

সেইদিনই ছুটির আগে সে আমাকে বলল যে সে জার্মান হলেও, ও দেশের জন্যে যুদ্ধ করতে হলেও সে কখনও নাৎসীদের সমর্থক ছিল না। সে বলল, পালাবে?

আমি বললুম, কি করে পালাব? ক্যাম্প থেকে পালাতে পারলেও যাব কোন্ দিক দিয়ে?

অটো বলল, এই খনি আমার মুখস্থ। গ্যাস খুঁজতে হয়, আমার গতি সর্বত্র অবাধ। খনির সুড়ঙ্গপথ পশ্চিমদিকে বরাবর গিয়ে একটা অরণ্যে শেষ হয়েছে। সেই খনিমুখে রাইফেল হাতে একটা মাত্র গার্ড পাহারা দেয়। গার্ডটাকে হত্যা করে পালানো শক্ত নয়। যাবে তো বল, আমি প্ল্যান করব। আমার কাছে ছোট একটা কম্পাসও আছে। লুকিয়ে অনেক চিজ জমা করেছি। পথে খাওয়া যাবে।

—চিজ কোথায় পেলে?

—ক্যান্টিনে একটা মেয়ে আছে, তার সঙ্গে ভাব জমিয়েছি। সে আমাকে হাতসাফাই করে বেশ খানিকটা চিজ দেয়। বাড়তি ভাগটা আমি লুকিয়ে রাখি।

—পালাতে আমি রাজি আছি তবুও আমাকে একটু ভাবতে দাও। উত্তর সাইবেরিয়া, অরণ্য অঞ্চল। গভীর অরণ্যে ভাল্লুক আছে, বড়

বড় জলাভূমি আছে, শীতল ও খরস্রোতা নদী আছে। আমি একটু ভেবে দেখি।

অটো বলল, পালাতে হলে আজই বা কাল। কারণ ব্যারাকে রায়ট হলে তারপরে পালানো অসম্ভব হয়ে যাবে, রায়টের পর বেঁচে থাকলেও ওরা নিশ্চয় বাকি সকলকে ব্যারাক থেকে বেরোতেই দেবে না।

আমি বলি, সেটা একটা কথা বটে কিন্তু কথা হল ঝুঁকি অনেক। অজানা ও দুর্গম পথে যদি মরেই গেলুম তাহলে পালিয়ে লাভ কি?

অটো আবার বলল, পালানো যদি সাব্যস্ত হয় তাহলে দেরি করা চলবে না।

পালাতে আমার আপত্তি নেই। আমার সন্দেহ হচ্ছিল অটোকে। ওকে আমি চিনি বটে কিন্তু ও যে স্পাই নয়, আমার সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করবে না তা জানব কি করে? ক্যাম্প কমাণ্ডাণ্ট ওকে আমার বিরুদ্ধে নিযুক্ত করেছে কিনা কে জানে?

সেদিন সন্ধ্যার পর খাবার সময় লক্ষ্য করলুম যে সকলে যেন চাপা উত্তেজনায় ভুগছে। তাহলে কি অটোর কথা সত্যি! আজ রাত্রেই কি দাঙ্গা হবে নাকি? কে কাদের আক্রমণ করবে? ব্যাণ্ডেরসদের, ব্র্যাটনয়দের?

আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। কত রাত্তির জানি না। গোলমালে ঘুম ভাঙে। দুজন লোক বেশ জোরে তর্ক করছে। অন্ধকারে একজন উঠে কোথায় যাচ্ছিল। কার হোঁচট খেয়ে পড়ে গেছে। ব্যাস্ দুজনে তর্ক লেগে গেল এবং হাতাহাতি। সকলে হৈ হৈ করে জেগে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তাণ্ডব শুরু হল। চেঁচামেচি, মারামারি। কিন্তু অন্ধকারে লোক চিনে ওরা মারামারি করছে কি করে?

কেউ কেউ কাগজ জ্বালাচ্ছিল। আমি একধারে সরে গিয়ে এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলুম ও শুনছিলুম। কেউ কেউ

আমাকে প্ররোচিত করছিল। আমি নিরপেক্ষ হয়ে পরিদর্শকের ভূমিকা নিয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

একসময়ে জোরালো টর্চ ও আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে একদল গার্ড এসে সকলকে বেধড়ক মার লাগাতে লাগল। যাকেই সামনে পাচ্ছে তাকেই মারছে। একসময়ে সব থামল। দেখা গেল বারোজন মরেছে, সতেরোজন ভীষণভাবে জখম, বাঁচার আশা নেই। থাকলেও বিনা চিকিৎসায় মরবে আর আমি ব্যতীত সকলে জখম। ভ্যালসফও জখম হয়েছে তবে খুব কম, কিছু কাটাকুটি।

পরদিন ব্রেকফাস্ট দেওয়া হল। তেতো ব্ল্যাক কফি ও এক পিস ব্ল্যাক ব্রেড। কফির মগে চুমুক দিতে দিতে একসময়ে ভ্যালসফ আমাকে একটু সরিয়ে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বলল, আমার একটা কথা কানে এল।

—কি কথা?

—ক্যাপটেন, মানে কমাণ্ডাণ্টের সহকারী বলছিল তোমাকে কোনো ছুতো করে আজ খুন করবে। সাবধানে থেকো।

আমি বললুম, 'দেখ ভ্যালসফ আমি মরবার জন্যে সবসময়ে প্রস্তুত। একটা বুলেট যদি এখনি আমার মাথা ভেদ করে চলে যায় তো আমি অবাক হব না, যদিও অবাক হবার আগেই আমি মরে যাব!'

লাঞ্চের কিছু পরে আমার ডাক পড়ল। আজ লাঞ্চ দিয়েছিল দু পিস, রুটি খানিকটা ঝোল, একটা আলু আর এক টুকরো চিজ। পেটের ক্ষিদে রয়েই গেল।

ক্যাম্প কমাণ্ডাণ্ট ডেকে পাঠিয়েছে। হলে ঢুকে দেখি একটা টেবিলে ক্যাম্প কমাণ্ডাণ্ট ও তার সহকারী ক্যাপটেন সাখালিন মুখ ঝুলিয়ে বসে আছে। তাদের কাছে যাবার পথে সামনাসামনি দুটো বেঞ্চে দুজন করে চারজন ষণ্ডামার্কা গার্ড বসে আছে। এই গার্ড চারটেকে আমি চিনি। এরা আগে আমাকে কোনো না কোনো সময়ে

প্রহার করেছে। এরা এখানে কেন? ভ্যালসফের কথাই কি ঠিক। কোনো ছুতো করে এরা আমাকে এখন হত্যা করবে?

মনে মনে তৈরি হই। আমি তো মরেই আছি তবুও দেখা যাবে কে কাকে মারে।

আমি যেই কমাণ্ডান্টের টেবিলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, বেঞ্চ দুটোর মাঝখানে গেছি অমনি একজন হঠাৎ তার পা বাড়িয়ে দিয়েছে। পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নিলুম।

শয়তান! মতলব ছিল আমি মুখ থুবড়ে পড়ে গেলে তোমরা আমাকে ফেলে মারবে। বটে?

যেখানে দাঁড়ালুম সেখানে পাশের টুলে জলভর্তি বেশ বড় একটা বোতল ছিল। আমি সেটা তুলে নিয়েছি। একটা গার্ড এগিয়ে আসছিল। সেই বোতল তার মাথায় এত জোরে মারলুম যে তার মাথাও ভাঙল বোতলও ভেঙে দু টুকরো হল। বোতলের গলা তখনও আমার হাতে ধরা।

বোতল ভেঙে একটা দিক ছোরার মতো ছুঁচলো হয়েছে। ইতিমধ্যে আরও একজন এগিয়ে এসেছে এবং বাকি দুজনও আমাকে আক্রমণ করবার চেষ্টা করছে।

দ্বিতীয় গুণ্ডাটা আমার কাছে আসতে না আসতে ভাঙা বোতলের ছুঁচলো মুখ খুব জোরে তার গলায় ঢুকিয়ে দিলাম। ভাঙা বোতল নিয়েই লোকটা মাটিতে পড়ে ছটফট করে পড়ে গেল। বেশিক্ষণ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়নি। শেষ।

দুটো গুণ্ডা আমার কাছে কোনো সমস্যাই নয়। দুটোর মাথা ধরে ঠকাঠক করে ঠুকে প্যাঁচ কসে মাটিতে ফেলে দিয়ে তাদের মুখে যথেষ্ট বুট দিয়ে মারতে লাগলুম।

লোক দুটোকে যখন মারছি তখন দেখি কমাণ্ডান্ট আর ক্যাপটেন চেয়ার ছেড়ে দরজার দিকে এগোচ্ছে। তাদের ভয় এবার বুঝি তাদের মারব। খুব সম্ভব তখন তাদের কোমরে পিস্তল ছিল না। তাহলে আমাকে এতক্ষণে ফিউজ করে দিত।

আমি তখন বেঞ্চে বসে পড়ে হাঁফাচ্ছি। চারটে লোক এমন নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে যে কে মরেছে বুঝতে পারছি না।

ব্যারাকে ফেরবার উপক্রম করছি। হলের বাইরে আসতেই রাইফেল হাতে প্রায় ছজন লোক আমাকে ঘিরে ফেলল। আমাকে একটা নির্জন খুপরিতে আটকে রাখা হল।

নির্জন সেলে তিনদিন আমাকে বন্ধ করে রাখা হল। এসময়ে আমাকে খারাপ খেতে দেওয়া হয়নি। চার পিস করে রুটি, ছুটো আলুসমেত ঝোল আর চিজ। কারণ কি? ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করিয়ে দেবে হয়তো। আমার কোনো আক্ষেপ নেই শুধু যদি জানতে পারতুম যে অ্যানালিসা ভাল আছে।

তিনদিন পরে আমার ডাক পড়ল। হলে ঢুকে দেখলুম টেবিলে বিচারক বসে আছে। একপাশে ক্যাম্প কমাণ্ডাণ্ট অপর পাশে যে বসে আছে তাকে আগে কখনো দেখিনি। আরও ছুজন আছে, এছাড়া রাইফেলধারী চারজন গার্ড।

বিচারকের টেবিলে রয়েছে হাড়ের তৈরী লম্বা একটি ছোরা। হাড়ের ছোরা কেন জানি। আসামীর বিচার শেষ হলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে না আজীবন নির্বাসন দেওয়া হবে এই ছুরি দিয়েই তা নির্ধারিত হয়।

ছোরাটা মাটিতে ফেলে দেওয়া হয়। ছোরার ডগা যদি আসামীর দিকে পড়ে তাহলে মৃত্যুদণ্ড, আর যদি বাঁট আসামীর দিকে পড়ে তাহলে আজীবন নির্বাসন।

ছোরা দেখেই আমি প্রস্তুত। যা হয় হবে।

বিচার আরম্ভ হল। আমাকে আবার আগাগোড়া সব প্রশ্ন করা হল। আজ পর্যন্ত কি করেছি তাও আবার বলতে হল। একঘেয়ে কথা বলতে বিরক্ত লাগছিল।

যাইহোক একসময়ে জেরা শেষ হল। সকলে কি পরামর্শ করল।

ক্যাম্প কম্যাণ্ডাণ্ট আমাকে আমার সেলে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, আজ রাত্রে বা কাল ভোরে তোমাকে অন্যত্র পাঠান হবে।

—কোথায় পাঠাবেন ?

—সে তোমার জানার দরকার নেই, যাও।

পরদিন ভোর হবার আগেই আমাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে আমার চুল ছেঁটে ও দাড়ি কামিয়ে দেওয়া হল, তারপর নতুন কোট, গ্রেটকোট, প্যাণ্ট, জুতো মোজা দস্তানা ও টুপি পরিয়ে দেওয়া হল। তারপর চারজন গার্ড আমাকে একটা জিপে তুলে হাতে হাতকড়া লাগিয়ে দিল।

আমি রীতিমতো অবাক। কোনো প্রশ্ন করতেই ভুলে যাচ্ছি। সুস্থিরভাবে চিন্তা করতে পারছি না।

রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি তাই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। একজায়গায় গাড়ি থামিয়ে আমাকে কিছু খেতে দেওয়া হল। কিছু মানে বেশ বড় দুটো চপ ও এক মগ কফি। তারপর চলছি তো চলছি।

দুপুরে আবার গাড়ি থামিয়ে কিছু খাওয়ানো হল। আবার যাত্রা। সন্ধ্যাবেলায় জিপ থামল। একটা রেল স্টেশনের সামনে গাড়ি থামল।

আমাকে জিপ থেকে নামিয়ে একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে দুজন মাত্র গার্ড ও একজন ইনস্পেক্টর ছিল। আমার সঙ্গে যে গার্ড ছিল তারা কিসব কাগজ সেই ইনস্পেক্টরকে দিল। কাগজগুলি নিয়ে ইনস্পেক্টর সই করে একপ্রস্থ কাগজ ফিরিয়ে দিতেই আমার সঙ্গে আসা গার্ডরা স্যালুট করে ফিরে গেল।

কি ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছি না।

গার্ড দুজনের জিম্মায় আমাকে রেখে ইনস্পেক্টর আমাকে অপেক্ষা করতে বলে টেলিফোন করতে গেলেন।

তিনি টেলিফোন করে ফিরে এলেন। একজন আরদালি এসে আমাকে একটা খাবারের প্যাকেট দিয়ে গেল। বলে গেল এর মধ্যে রাত্রের খাবার আছে।

ইনস্পেক্টর নিজে আমার হাতকড়া খুলে দিয়ে বলল, পালাবার চেষ্টা কোরো না কারণ ধরা পড়লে বিনা বিচারে তোমাকে হত্যা করা হবে।

এটা কোন্ রেলস্টেশন? আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কেন?

কোনো প্রশ্ন নয়।

আমি ও গার্ড দুজন সেই ঘরেই অপেক্ষা করতে লাগলুম। ইনস্পেক্টর বাইরে গিয়ে কোলাপসিবল গেট টেনে দিয়ে তালা লাগিয়ে চলে গেলেন।

রাত্রি প্রায় বারোটার সময় আমাকে মস্কোগামী ট্রেনে তুলে দেওয়া হল। মস্কো থেকে বারলিন। আমি বোধহয় বেঁচে গেলুম।

বারলিনে আমাকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হল। আমি এখন মুক্ত। পরে শুনেছিলুম আমি যে ব্রিটিশদের হয়ে গুপ্তচর-গিরি করেছিলুম সেটা রুশপক্ষ যাচাই করেছিল এবং এইসময়ে বন্দী বিনিময়ও হচ্ছিল। আমি সেইজন্যে ছাড়া পেয়েছিলুম।

এরা লিস্ট দেখে আমার বৌ অ্যানালিসার কথা বলতে পারল না। দুদিন পরে আমাকে প্লেনের টিকিট দেওয়া হল।

লণ্ডনের কিছুদূরে এক গ্রামে আমার বাড়ি। বাড়ি পৌঁছে দেখি অ্যানালিসা। বন্দী বিনিময়ের ফলে সেও ছাড়া পেয়েছে। তখন আমাদের দুজনের যে আনন্দ হল সে আনন্দ শত চুম্বনেও শেষ হল না।

যুদ্ধ তো শেষ হল। শান্তি প্রতিষ্ঠাও হল কিন্তু সারা ইউরোপ ও ইংলণ্ড তখন বিপর্যস্ত। পরাজিত দেশের দুর্ভোগের তো কথাই নেই, যে দেশ জয়লাভ করেছে তাদেরও নানা সমস্যা!

এই সমস্যা হ্যানস বা অ্যানালিসাও এড়াতে পারল না। চাকরি জোটে না, যাও বা জোটে তা সাময়িক। অ্যানালিসা টাইপ করতে জানত। সে টাইপিস্ট হিসেবে মাঝে মাঝে ঠিকে কাজ পায় আর হ্যানসও হাতের কাছে যে কাজ পায় তাই করে। তার ইচ্ছে ছিল

একটা সার্কাস পার্টিতে ঢোকা, কিন্তু তখন সার্কাস পার্টি কোথায়? ইউরোপে কোথাও তাদের অস্তিত্ব নেই।

যাইহোক দুজনে কোনোরকমে চালিয়ে নেয়। এইভাবে কয়েকটা বছর কাটল। কিন্তু জিনিসপত্তরের দাম বাড়ছে। যা আয় তাতে আর কুলনো যাচ্ছে না।

হ্যানস শুনল পশ্চিম জার্মানিতে গেলে এখন চাকরি পাওয়া যায়। অ্যামেরিকানরা অর্থ সাহায্য করছে, জার্মানরা বোমাবিধ্বস্ত শহর ও কারখানা আবার গড়ে তুলছে।

ওরা দুজনে স্থির করল জার্মানিতেই যাবে। দুজনে মিলে জার্মানি যাবার জন্যে তৈরি হতে লাগল। কিন্তু ইতিমধ্যে একটা ব্যাপার ঘটে গেল।

হ্যানস কোনো একটা কাজে লণ্ডনে এসেছিল। পথ চলতে চলতে হাইড পার্কের কাছে মস্ত বড় বাড়ি ওর চোখে পড়ল। দেখল গেটের একধারে সাইনবোর্ড ঝুলছে, এমব্যাসি অফ দি ইউ এস এস আর। সোভিয়েট রাশিয়ার দূতাবাস। কি মনে করে সে দূতাবাসে ঢুকে পড়ল।

দূতাবাসের রিসেপশেনিষ্টের সঙ্গে সে যখন কথা বলছে তখন একজন রাশিয়ান অফিসার কোথাও যাচ্ছিল। হ্যানসকে দেখে সেই অফিসার সহসা দাঁড়িয়ে পড়ে হ্যানসকে আপাদমস্তক লক্ষ্য করতে লাগল। হ্যানস অসোয়াস্তি বোধ করতে লাগল কিন্তু লোকটিকে হ্যানসের চেনা মনে হল। কোথায় যেন দেখেছে। মনে পড়ল, এ কি সেই লোক।

রাশিয়ান অফিসার তাকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার নাম কি হ্যানস স্যানডাউ?

হ্যানস বলল, আমার ঐ নাম। আমি তোমাকেও চিনতে পেরেছি। আমাকে তুমিই তো হ্যালে জেলখানায় জেরা করতে, তাই না?

হ্যাঁ, আমিই সেই লোক, তবে সেসব দিনের কথা ভুলে যাও, আমরা এখন বন্ধু, আমার নাম নিকোলাই বেলভ। ইংরেজী জানি

বলে ব্রিটিশ দূতাবাসে চাকরি পেয়েছি। তা তুমি এখানে কি করছ?

হ্যানস বলল, সে চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছে তবে আপাতত ঠিক করেছে সে পশ্চিম জার্মানিতে যাবে, শুনেছে সেখানে গেলেই চাকরি পাওয়া যায়।

নিকোলাই বলল, তা পাওয়া যায় বটে, মাইনেও ভালো দেয় কিন্তু খাটিয়ে মারে। তার চেয়ে···ঠিক আছে, তুমি আমার সঙ্গে এস, দেখি তোমার জন্যে কিছু করতে পারি কিনা! একদিন তোমাকে খুবই কষ্ট দিয়েছি তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তো?

নিকোলাই ওকে নিজের অফিসঘরে নিয়ে গেল। অফিসঘরটা সাদামাটা! টেবিল চেয়ার সবই আছে কিন্তু সবই সাধারণ, আরামপ্রদ কোনোটাই নয়। কিন্তু ঘর আলো করে পাশে একটি ছোট টেবিলের সামনে বসে আছে এক সুন্দরী, একটা খাতায় মন দিয়ে কিছু লিখছে। সত্যিই ঘর আলো করা রূপসী। একবার মুখ তুলে ওদের দেখে নিয়ে আবার নিজের কাজে মন দিল। সম্ভবত নিকোলাইয়ের সেক্রেটারি।

'বোসো হ্যানস' বলে নিকোলাই নিজের চেয়ারে বসে সেই সুন্দরী যুবতীকে বলল কফির ব্যবস্থা করতে।

নিকোলাই হ্যানসের খবরাখবর জেনে নিয়ে বলল, তোমাদের দুজনকেই আমি এখনই কাজ দিতে পারি, দুটো কাজ আছে, যেটা তুমি পছন্দ কর।

বেশ কি কাজ তুমি বল, হ্যানস বলল।

তোমাকে সোজাসুজিই বলছি, কেজিবি-র নাম শুনেছ?

হ্যাঁ শুনেছি, তোমাদের গুপ্তচর সংস্থা, তা কি হয়েছে?

তুমি ও তোমার স্ত্রী আমাদের এজেন্টের কাজ করতে পারবে। খুব ভাল টাকা পাবে। আমি এখন কেজিবি-র অফিসার।

তার মানে তোমাদের স্পাই? না এ কাজটা আমরা পারব না। অন্য কাজটা কি?

বলছি, তার আগে বলি তোমাদের আমরা ইংলণ্ডে রাখতুম না। ঐ পশ্চিম জার্মানিতেই পাঠাতুম, অ্যামেরিকানদের দলে ভিড়ে খবর যোগাড় করতে, এই আর কি।

অন্য কাজটা কি বল।

তুমি রাশিয়া যেতে রাজি আছ, মস্কোয়?

মস্কোয়?

হ্যাঁ, খাস মস্কোয় তুমি থাকবে, মাঝে মাঝে হয়ত অন্য শহরে যেতে হতে পারে, কাজ যে রোজই করতে হবে তা নয় ডাক পড়লে তবেই তোমার কাজ। ভালো মাইনে পাবে, থাকবার জন্যে ঘর পাবে, রাশিয়ার শীতের সুযোগ পাবে, রেশনে তোমাকে কিছু বেশি মাখন, চিজ আর ব্রাউন ব্রেড দেওয়া হবে। রাজি?

কাজটা কি তাইতো বললে না তবে তো বলব রাজি কি না, হ্যানস বলল।

এ কাজে তোমার অভিজ্ঞতা আছে তাই তোমাকেই মনোনীত করছি, কাজটা হল ঘাতকের কাজ, ডাক পড়লে তোমাকে যেয়ে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে খতম করতে হবে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গুলি করে। এবার বল রাজি আছ?

হ্যানস বলল, উত্তম বেতন পেলে রাজি আছি তবে আমার বউকেও আমার সঙ্গে মস্কো যেতে দিতে হবে এবং তাকে একটা কাজও দিতে হবে।

নিকোলাই বলল, বেশ তোমার বউকে তোমার সঙ্গে যেতে দেওয়া হবে তবে তার চাকরির কথা আমি এখনি বলতে পারছি না। তুমি আজ এস, বৌয়ের সঙ্গে পরামর্শ কর, আসছে সপ্তাহে ঠিক এই সময়ে এখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে ইতিমধ্যে আমি কর্তাদের সঙ্গে কথা বলে পাকা করে রাখব আর সেই দিনই তোমার বেতনের কথাও বলে দোব।

হ্যানস মনে মনে বলল, অনেক মানুষই তো মেরেছি আরও না হয়

কতকগুলো রুশকে মারব। রুশরা আমাকে অনেক নির্যাতন করেছে, কিছু প্রতিশোধ তো নেওয়া হবে।

নিকোলাইকে সে বলল, আমার একটা শর্ত আছে সেই শর্তটার বিষয় তুমি কর্তাদের বোলো।

কি শর্ত?

আমি যদি পশ্চিম জার্মানিতে চাকরি করতুম তাহলে আমি চাকরির পর সঞ্চিত টাকা ইংলণ্ডে নিয়ে যেতে বা পাঠাতে পারতুম কিন্তু রাশিয়া থেকে তোমরা আমাকে রুবল আনতে দেবে না তাই আমার শর্ত হল, তোমরা আমাকে যে বেতন দেবে, তার অর্ধেক তোমাদের লণ্ডন দূতাবাস মারফত আমার নামে একটা ব্যাংকে জমা রাখবে, অবশ্যই লণ্ডনের কোনো ব্যাংকে! এই আমার শর্ত, এই শর্তে তোমরা রাজি না হলে আমি মস্কো যাব না।

পরের সপ্তাহে একই বারে ও সময়ে হ্যানস নিকোলাই-এর অফিসে গেল। নিকোলাই ওকে বসিয়ে বলল, আমি আমাদের রাষ্ট্রদূতের অনুমতি নিয়ে মস্কোয় আমাদের সেণ্ট্রালের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছি, তোমার বরাত ভাল, সেণ্ট্রাল তোমার শর্তে রাজি হয়েছে, আপাতত রাশিয়াতে উপযুক্ত ঘাতক পাওয়া যাচ্ছে না, খবরটা আমি জানতুম তাই সেদিন তোমাকে দেখতে পেয়ে আমি তোমাকে নিযুক্ত করা সাব্যস্ত করি ও তোমার নাম পাঠিয়ে দিই। কিন্তু তুমি রুশ নও, এজন্যে প্রথমে কর্তাদের আপত্তি হয়েছিল কিন্তু আমি তোমার দায়িত্ব নিতে সেণ্ট্রাল রাজি হয়, দেখো আমাকে যেন ফাঁসিও না।

হ্যানস বলল, আমি তোমাকে কি করে ফাঁসাব?

তুমি সতর্ক থাকবে, কখনও কারও কাছে পুঁজিবাদী ব্যক্তি বা সাম্রাজ্যবাদী কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে কিছু বলবে না এবং সোভিয়েট সরকারের কোনো সমালোচনা তো করবেই না এমনকি যদি দেশে কাউকে চিঠি লেখ তো রাশিয়ার গুণ ছাড়া দোষের কথা কিছু লিখবে

না। দোষ তুমি কিছু পাবে না অবশ্য তোমার দৃষ্টিতে তা দোষ বলে যদি মনে হয়…;

আরে না না, আমি ওসবের মধ্যে যাব না। আচ্ছা, আমি যদি চেলাচামুণ্ডা পাই তো ছোটখাট একটা সার্কাসের দল তৈরি করতে পারব কি ?

আপত্তির কিছু দেখছি না, তবে তুমি মস্কোয় পৌছে তোমার কর্তাদের অনুমতি নিয়ো। তুমি ওখানে গেলে তোমাকে তোমার কাজ বুঝিয়ে দেওয়া হবে, কিছুদিন ট্রেনিং-এ থাকতে হবে আর কি করবে আর কি না করবে এ সবই তোমাকে ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া হবে।

আমার বৌ অ্যানালিসার কাজকর্মের কিছু ব্যবস্থা হবে ?

হতে পারে কিন্তু তোমার বৌ কোনো কাজ জানে ?

জানে, ও মেয়েদের পোশাক তৈরি করতে পারে, একটা বেকারিতে কেক, রুটি আর পেস্ট্রি তৈরি করত, এছাড়াও টাইপ করতে জানে, কিন্তু রুশ ভাষা ত জানে না।

বাঃ তোমার বৌ তো কাজের মেয়ে, কাজ জুটে যাবে, আমি একখানা চিঠি দিয়ে দোব।

আমাদের কবে যেতে হবে ?

শিগগির কয়েক দিনের মধ্যে, তোমার বাসার ঠিকানা দিয়ে যাও, আমি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব। হয়তো সব নির্দেশ দিয়ে তোমাদের প্লেনের টিকিট এবং রাহাখরচ বাবদ অগ্রিম, তোমাদের পরিচিতিপত্র সবকিছু লোক মারফত পাঠিয়ে দোব, তুমি এখানে না এলেও চলবে তবে যাবার সময় এয়ারপোর্টে আমাকে দেখতে পাবে।

আচ্ছা আমার সরকারের কোনো আপত্তি হবে না ত ?

আমরা তার ব্যবস্থা করে রেখেছি। তুমি এখান থেকে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের প্লেনে রোম যাবে, রোম থেকে এরোফ্লটে মস্কো। রোমে আমাদের লোক থাকবে। সব কাজ পাকা করে রেখেছি, তোমার কোনো চিন্তা নেই।

এক মাসের ওপর হয়ে গেল হ্যানস মস্কো পৌঁছেছে ; প্রথমে তাকে ও তার বৌকে রুশ কথ্য ভাষা শিখতে হবে, তারপর হ্যানসের দু সপ্তাহ ট্রেনিং। ভাষাটা মোটামুটি বলতে ও বুঝতে পারলে অ্যানালিসাকে একটা ক্যান্টিনের বেকারিতে চাকরি দেওয়া হবে।

হ্যানসকে একটা বড় বিলডিং-এ থাকবার জন্য ঘর দেওয়া হল তবে পৃথক বাথরুম বা কিচেন নেই। কমিউনিটি বাথরুম, কিচেন ও কোল্ড স্টোরেজ আছে। ঢালাও ব্যবস্থা, কোনো অসুবিধে নেই।

বিলডিং সংলগ্ন একটা জিমন্যাসিয়াম। ছেলেমেয়েরা এখানে জিমন্যাস্টিক করে, ব্যায়াম করে, ভলিবল ও বাস্কেটবল খেলে। হ্যানস তখনই মনে মনে স্থির করল, এই তো! এইসব ছেলেমেয়েদের ও শিখিয়ে পড়িয়ে এইখানেই একটা সার্কাসের দল তৈরি করবে। ছেলেমেয়েরা কি সুন্দর জিমন্যাস্টিক করে, কি সাবলীল তাদের দেহ। এমনটি সে আর কোথাও দেখেনি। নিজের দেশে তো নয়ই।

যাইহোক হ্যানস ও অ্যানালিসা বেশ মানিয়ে নিল। কাজকর্ম দুজনে ভালই করতে লাগল। দেখতে দেখতে বছর ঘুরে গেল।

হ্যানস বোকা নয়। রীতিমতো ধূর্ত। সে তার কাজকর্মের মধ্যে রাশিয়ার কেজিবি-র কাজকর্ম নীরবে লক্ষ্য করত। কেজিবি সম্বন্ধে তার অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হল। দেশে ফিরে সে তার এই সকল অভিজ্ঞতার কাহিনী একজন সাংবাদিকের কাছে বলেছিল। হ্যানসের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সেই সাংবাদিক লণ্ডনের 'নিউজ অফ দি ওয়ার্ল্ড' পত্রিকায় একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

সেই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু আমরা গল্পাকারে নিচে তুলে ধরছি। পড়তে পড়তে গা শিউরে ওঠে।

মস্কোর কেন্দ্রে মেসচ্যাণ্টস্কায়া স্ট্রিট। এই রাস্তার ওপরেই রাশিয়ার গুপ্তচর সংস্থা কেজিবি-র হেডকোয়ার্টার। রাস্তা দিয়ে একটা কালো সিডান গাড়ি ছুটে চলেছে। গাড়িটা চালাচ্ছে একজন ড্রাইভার।

গাড়ির ভেতরের সিটে তিনজন লোক বসে আছে তাদের মধ্যে একজনের অঙ্গে রেড আর্মির অফিসারের ইউনিফর্ম। বাকি দুজনের সাধারণ পোশাক। এরা অ্যামেরিকান। এরা রাশিয়ায় আশ্রয়-প্রার্থী। অ্যামেরিকা থেকে কেজিবি এদের স্মাগল করে রাশিয়ায় নিয়ে এসেছে।

সিডান গাড়িটা থামল একটা মস্ত বড় বাড়ির সামনে। বাড়িটা পুরনো। ইংলণ্ডের ভিকটোরিয় যুগের বাড়ির মতো দেখতে, প্রাসাদোপম কিন্তু বাড়িটা অনেক দিন রং করা হয়নি। বোধহয় ইচ্ছে করে অথচ ভেতরটা মেরামত বা রং করা হয়। এবাড়ির ওপর কারও দৃষ্টি না পড়ে, কর্তৃপক্ষের মতলব বোধহয় এইরকম।

এই বাড়িতে কেজিবি-র অফিস কুড়ি বছর আছে আর এই বাড়ি থেকেই পরিচালনা করা হয় পৃথিবীর বৃহত্তম স্পাই ও কাউন্টারস্পাই-এর কাজকর্ম। এদের জাল রাশিয়ার ও পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তৃত। এরা বিশেষ করে অ্যামেরিকার রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেভাবে প্রবেশ করেছে, অ্যামেরিকার গুপ্তচর সংস্থা সি আই এ তেমনভাবে রাশিয়ায় বা রাশিয়া অধিকৃত দেশগুলিতে প্রবেশ করতে পারেনি। কেজিবি এমনই একটা সংগঠন এবং সোভিয়েট সরকার কেজিবি-র এতটা নির্ভরশীল যে আজ যদি কেজিবি কোনো কারণে উঠে যায় তাহলে সোভিয়েট রাশিয়ায় শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়বে।

রেড আর্মি অফিসারের নাম মেজর লিওনিড সারকফ। বিশাল চেহারা, মস্তবড় মাথা। মুখ দেখে তার কোনো ভাবান্তর বোঝা যায় না। কেজিবি মহলে তার খুবই কদর। অনেক দুরূহ কাজ সে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করেছে।

তার সঙ্গী অ্যামেরিকান দুজনও বেশ লম্বা চওড়া, তথাপি সার-কফের পাশে তাদের বেশ ছোট মনে হচ্ছিল, যেন হাতির পাশে গণ্ডার।

গাড়ি থেকে সারকফ আগে নেমে ওদের নামতে বলল। আগে নামল উইলিয়ম মার্টিন। মাথার চুল বাদামি, গায়ের রং গোলাপি।

তারপর নামল বেনরন মিচেল। মার্টিন অপেক্ষা এ একটু রোগা। মাথার চুল কালো, ফ্যাকাশে নীল চোখ, চোখে পুরু ফ্রেমের চশমা।

অ্যামেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন ডি সি থেকে পঁচিশ মাইল পশ্চিমে ফোর্ট জর্জ মিড-এ ন্যাশানাল সিকিউরিটি এজেন্সির অধীনে ওরা দুজনেই গুপ্ত কোড ওয়ার্ড নিয়ে কাজ করত। সাংকেতিক ভাষার পাঠোদ্ধার বা নতুন সাংকেতিক শব্দগঠন ছিল এদের কাজ। এছাড়া ওরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনাও করত।

তিন বছর কাজ করার পর ওরা একদিন অদৃশ্য হয়ে গেল, কেউ বলতে পারল না ওরা কোথায় গেছে। প্রথমে সারা অ্যামেরিকা তোলপাড় করা হল তারপর ইউরোপের সি আই এ-কে সতর্ক করে দেওয়া হল। সাংকেতিক বার্তা নিয়ে এরা কাজ করছিল, এদের রীতিমতো গুরুত্ব আছে।

অনেক অনুসন্ধান করেও তাদের কোনো খবর পাওয়া যায় না। দিনের পর দিন কেটে যায়। ন্যাশানাল সিকিউরিটি এজেন্সির লেফটেনাণ্ট জেনারেল জন স্যামফোর্ড, এফ বি আই, সি আই এ এবং অন্যান্য সংস্থা এবং পরিবারের লোকজন রীতিমতো চিন্তিত হয়ে পড়ে।

অনেক চেষ্টা করে জানা যায়, যে ওরা মেকসিকো হয়ে হাভানা গিয়েছিল তারপর আর তাদের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

বাড়িটার সামনের দেওয়ালে একটা বড় ঘড়ি লাগানো আছে। ঘড়ি দেখে সারকফ ওদের দুজনকে বলল, চল চল তাড়াতাড়ি, কমরেড পিয়টর আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

পুরনো বুকচাপ বাড়িটায় ঢোকবার আগে মার্টিন ও মিচেল দৃষ্টি বিনিময় করল। এইখানেই কি কেজিবি-র অফিস? নাকি সারকফ ওদের অন্য কোনো বাড়িতে নিয়ে এল? কেজিবি এত বড় একটা সংগঠন, তাদের অফিস এই বাড়িতে? ওদের সন্দেহ হচ্ছে।

কমরেড পিয়টর কে? তার নাম তো ওরা শোনে নি?

যাইহোক বাড়ির ভেতরে ঢুকে একটু নিশ্চিন্ত হল কারণ বাড়ির

ভেতরটা বাইরের তুলনায় অনেক ভাল। দামী আসবাবপত্র না থাকলেও বেশ পরিষ্কার ও ঝকঝকে। হালে বোধহয় রং ফেরানো হয়েছে।

মার্টিন ও মিচেলের পক্ষে কমরেড পিয়টরের নাম জানা মোটেই সম্ভব নয় এমনকি অধিকাংশ রুশ তার নাম শোনেনি। গুপ্তচর সংস্থা কেজিবি সম্বন্ধে সবকিছু গোপন রাখা হয় এবং রাখা উচিতও। কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরে কি ঘটছে এ খবরও অধিকাংশ রুশ নাগরিকই রাখে না। পার্টির ওপর তাদের বিশ্বাস আছে, পার্টি অমানবিক কাজ করবে না তবে অন্যায় করলে এবং নিজ কর্তব্য কাজ না করলে কঠোর সাজা পেতে হবে। তাই সকলে দরদ দিয়ে নিজ নিজ কাজ করে।

কাজ না করলে যুদ্ধ বিধ্বস্ত রাশিয়াকে তারা এত দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারত না। হতে পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অঢেল সাহায্য পাঠিয়েছিল পুনর্গঠনের জন্য, কিন্তু সাহায্য এলেই তো হবে না। সাহায্যকে কাজে লাগাতে হবে। তাই তারা ভেঙে পড়া শহর, নদীর বাঁধ, কলকারখানা দ্রুত তৈরি করে নিয়েছিল। জার্মানির নাৎসীবাহিনী পিছু হঠবার সময় পুড়িয়ে দিয়েছিল সবকিছু, যাকে বলে স্কর্চড আর্থ পলিসি বা পোড়ামাটির নীতি। ক্ষেতখামারও তারা দ্রুত উদ্ধার করেছিল। তা নইলে রাশিয়ায় দেখা দিত হতাশা আর অনাহার। রুশ জাতি পরিশ্রমী বলেই তারা আবার দ্রুত উঠে দাঁড়াতে পেরেছিল। জাপান ও পশ্চিম জার্মানি সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। সেখানে আজ প্রাচুর্য।

যাইহোক আমরা আমাদের কাহিনীতে ফিরে আসি।

পিয়টরের পুরো নাম পিয়টর মিখাইলোভিচ বোগডানভ। সোভিয়েট আর্মিতে তার পদমর্যাদা কর্নেল জেনারেল, ওটা একটা আবরণ। জনসাধারণ জানে বোগডানভ আর্মি অফিসার, তার আর কোনো নির্দিষ্ট ডিউটি নেই কিন্তু সরকারীভাবে সে হল কেজিবি-র

একটি বিশেষ বিভাগের হর্তাকর্তা, ডিরেকটর। সেই বিভাগের নাম 'অটডায়েল-আই, কেজিবি।'

মার্টিন ও মিচেল যখন স্বল্পালোকিত করিডর দিয়ে সারকফকে অনুসরণ করে যাচ্ছিল তখন তারা খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিল, পুরোপুরি নয়। কিছু ঘাবড়িয়েও গিয়েছিল।

চারদিকে কেমন একটা চাপা থমথমে ভাব। দুজনে অনুভব করছিল তাদের বিশেষ কোনো মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। তাদের পেয়ে রুশরা বুঝি ধন্য। কিন্তু তাদের এই অনুভূতি বা ধারণা ভুল। রাশিয়ার যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু মিটিয়ে নিয়ে ওদের বেকার বসিয়ে রাখবে, খেতে পরতে দেবে, মাসোহারাও দেবে, থাকবার জায়গাও দেবে কিন্তু নিষ্কর্মা করে রাখবে। অন্য কোনো দেশে যেতেও দেবে না, স্বদেশে তো নয়ই। যদি ভবিষ্যতে কখনও দরকার হয় তখন তাদের ডাক পড়বে।

রাশিয়ায় পৌঁছবার পর তাদের কি করতে হবে এ বিষয়ে তাদের কিছু বলা হয়নি। সোভিয়েট বৈদেশিক মন্ত্রকের প্রধান প্রচার-অধিকর্তা বা চিফ প্রোপাগাণ্ডা অফিসার তাদের দুজনকে মেজর সারকফের হাতে তুলে দিলেন। এই অফিসারের নাম খারলামভ। সারকফকে খারলামভ বলে দিল যে মার্কিনী দুজনকে কমরেড পিয়টরের কাছে হাজির করবার আদেশ এসেছে ওপর থেকে।

করিডর পার হলে এক কোণে কমরেড পিয়টরের ছোট অফিসঘর। মার্টিন ও মিচেলের আগে রাশিয়াতে আশ্রয়প্রার্থী অনেক বিদেশী এই করিডর দিয়ে হেঁটে গেছে।

সকলে আবার আশ্রয়প্রার্থী নয়। ধরা পড়ে গেছে এমন বিদেশী গুপ্তচর বা বিশ্বাসঘাতক রুশও আছে। কোনো রুশ বিজ্ঞানী কোনো দেশের নাগরিক হয়ে, বা দীর্ঘদিন সে দেশে বাস করে বিজ্ঞানচর্চা করছে এমন বিজ্ঞানীকেও অপহরণ করে ধরে আনা হয়েছে। কারণ, সোভিয়েট রাশিয়ার তাকে বিশেষ প্রয়োজন।

কমরেড পিয়টর বোগডানভ তাদের যাচাই করে দেখবে তারা

রাশিয়ার বন্ধু কি না, তাদের কোনো কাজে লাগানো যাবে কি না, তারা রাশিয়ার পক্ষে বিপজ্জনক কি না, তারপর তাদের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হবে।

এই সকল ব্যক্তির সঙ্গে কমরেড পিয়টর বেশিক্ষণ কথা বলেন না, বড়জোর পনেরো মিনিট, বেশি কথা বলার তার সময় নেই। কথা শেষ হলেই তাদের যথাস্থানে পাঠান হয়। কমরেড পিয়টর এরপর তাদের নিয়ে কি করা হবে সে বিষয় প্রাইম মিনিস্টারকে জানিয়ে দেবে। এই সময় প্রাইম মিনিস্টার ছিল ক্রুশ্চেফ যিনি তদানীন্তন প্রাইম মিনিস্টার বুলগানিনের সঙ্গে ভারতে এসেছিলেন। ভারত থেকে দেশে ফেরার পর বুলগানিন বাতিল হয়ে যান এবং ক্রুশ্চফ প্রধানমন্ত্রী বা প্রিমিয়ার হন।

কমরেড পিয়টর বোগডানভের ওপর ক্রুশ্চফের বিশ্বাস ছিল। সে যা অনুমোদন করে পাঠাত ক্রুশ্চফ তা সমর্থন করত। ফাইলে লিখে দিত 'ও কে'।

কি রাশিয়া, কি অ্যামেরিকা, কি ফ্রান্স বা ইংলণ্ড বা অন্য কোনো দেশের কোনো ব্যক্তি কূটনীতিকের আবরণে বা দূতাবাসের কর্মীর আবরণে নিজ দেশের হয়ে গুপ্তচরগিরি করে।

এইরকম একজন রুশ নাগরিক বিদেশে ধরা না পড়লেও সন্দেহ উদ্রেক করেছিল তাই সেই দেশ সেই রুশ কূটনীতিককে বহিষ্কার করে রাশিয়ায় ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিল।

সেই রুশ কূটনীতিককে কমরেড পিয়টরের সামনে হাজির করা হল। কমরেড পিয়টর তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে তার ফাইল ক্রুশ্চফের কাছে পাঠিয়ে দিল। ক্রুশ্চফ একবার চোখ বুলিয়ে লিখে দিলেন 'ও কে'।

কেজিবি হেডকোয়ার্টারে মাটির নিচে একটা 'কারজের' আছে। কনক্রিটের তৈরি শব্দ নিরোধক একটা কুঠুরি আছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সেই কুঠুরিতে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর তাকে দাঁড় করিয়ে পিছন

থেকে মাথায় বা ঘাড়ে গুলি করে খতম করা হয়। মেঝেয় যে রক্ত পড়ে তা সঙ্গে সঙ্গে সাফ করার ব্যবস্থা আছে।

তারপর সেই হতভাগ্যের লাশ নদী বা খালে ভাসতে দেখা যায় বা কোনো কানাগালতে পড়ে থাকতে দেখা যায়। কে তাকে খুন করে তার লাশ ভাসিয়ে দিয়েছে কে জানে? তবে পুলিস তদন্ত চলছে।

তদন্তের ফল সম্বন্ধে কেউ প্রশ্ন করে না কারণ সোভিয়েট রাশিয়ায় সরকারের সমালোচনা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

সারকফ মার্টিন ও মিচেলকে কমরেড পিয়টরের সামনে হাজির করল। পিয়টর যেন একজন জ্ঞানী অধ্যাপক। অবশ্য সে একদা কিয়েভ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে গণিতের অধ্যাপক ছিল।

মার্টিন ও মিচেল দেখল এক কাঠের ওধারে যে লোকটি বসে আছে সে বেশ লম্বা, একটু মোটা, মাথায় টাক। টেবিলটি পরিষ্কার, কোনো কাগজ, ফাইল নেই এমনকি কলম বা পেনসিলও নেই।

পিয়টর অমায়িকভাবে হেসে মার্টিন ও মিচেলকে বসতে বলল। দরজা বন্ধ করে দরজায় ঠেস দিয়ে সারকফ দাঁড়িয়ে রইল।

মোটা গলায় কমরেড উইলিয়ম মার্টিন, কমরেড বেরনল মিচেল তোমরা আরাম করে বোসো।

তারপর ড্রয়ার খুলে ব্রাউন পেপারের একটা খাম বার করে বলল, তোমার সমস্ত পরিচয় আমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই খামের মধ্যে সব আছে, যাইহোক তোমরা আমাদের দেশে রাজনীতিক আশ্রয় চাও তাই না? পুঁজিবাদী, ধনতান্ত্রিক ও যুদ্ধবাজ দেশ থেকে যারা আমাদের দেশে আশ্রয় চায় তাদের আমরা বিমুখ করি না। আমার প্রশ্ন তোমরা আমাদের এই আসল গণতান্ত্রিক দেশে কি করতে চাও?

মিচেল তার চশমাজোড়া নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। কি বলবে ঠিক করতে পারছিল না, সে তখনও পুরো সহজ হতে পারেনি। মার্টিন অতটা নারভাস হয়নি। সে স্বাভাবিক কণ্ঠেই উত্তর দিল, আমরা

দুজনে সোভিয়েট ইউনিয়নে বরাবর বাস করতে চাই, এ দেশের নাগরিকত্ব চাই এবং আমাদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চাই।

পিয়টর নরম সুরে বলল, তোমাদের উদ্দেশ্য মহৎ, প্রশংসাযোগ্য, আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, হ্যাঁ তোমরা আমাদের দেশে পড়াশোনা করতে পারবে, আমাদের নাগরিকত্বও মঞ্জুর করা যাবে। তোমরা তো গণিত জান, বেশ, তোমাদের উপযুক্ত চাকরিও যোগাড় করে দেওয়া যাবে আর তোমরা তোমাদের দেশে যে বেতন পাচ্ছিলে এখানেও সেই বেতনই পাবে।

পিয়টরের আশ্বাসবাণী শুনে মিচেল তখন সহজ হল। পিয়টর বুঝতে পেরেছিল যে ছোকরা নারভাস হয়েছে। ওকে সহজ করা দরকার। মিচেল তার চশমা চোখে পরে নিল। অ্যামেরিকার কোনো মিলিটারি তথ্য দূরের কথা, অ্যামেরিকা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই পিয়টর করল না। পিয়টর জানে আর কয়েকদিন পরে ওরা নিজেরাই অনেক গোপন খবর জানাবে। ওরা তো সাংকেতিক ভাষা নিয়ে কাজ করত। অনেক খবর ওদের জানা আছে।

তবে পিয়টর ওদের সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে লাগল, ওরই মধ্যে কিছু প্রশ্নও অজ্ঞের মতো ছুঁড়ে দিল। ওরাও সহজভাবে তার জবাব দিল।

পনেরো মিনিট দেখতে দেখতে কেটে গেল। মার্টিন ও মিচেল দারুণ খুশি। কমরেড পিয়টর বেশ ভালো লোক, একজন বন্ধু পাওয়া গেল। তবে আমরা রাশিয়া সম্বন্ধে যত বেশি জানি কমরেড অ্যামেরিকার সাধারণ জীবন সম্বন্ধেও ততটুকু জানে না।

মেজর সারকফ ওদের নিয়ে চলে গেল। ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বোগডানভ সোভিয়েট বৈদেশিক মন্ত্রকে ফোন করে প্রোপাগাণ্ডা চিফ খারলামভকে চাইল। খারলামভ ফোন ধরতে তাকে বলল, দুটো মাল পাঠাচ্ছি, এরা স্বদেশের নিন্দায় মুখর হয়ে উঠবে শুধু একটু উস্‌কে দিয়ো। দারুণ পাবলিসিটি হবে, তুমি রেডিও মারফত

ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করবে যাতে অ্যামেরিকার মানুষও শুনতে পায়। মিলিটারি খবর এখন জানতে চেয়ো না, ওসব জানবার সময় আপনাআপনি আসবে।

খারলামভ সেইদিনই ওদের জন্যে প্রেস-কনফারেন্সের ব্যবস্থা করল। খবরের কাগজ, রেডিও এবং টিভি-র প্রতিনিধিরা এল, ঘর ভর্তি হয়ে গেল। বিরাট আয়োজন। ব্যাপার দেখে মিচেল ও মার্টিন প্রথমে থতমত খেয়ে গিয়েছিল তারপর মনে করল তাদের উপস্থিতিকে গুরুত্ব-দেওয়া হচ্ছে, তারা খুব খুশি হল।

একটা দুটো নয়, ওদের সামনে রাখা হল এগারোটা মাইক্রোফোন, রেডিও মারফত ব্যাপক প্রচারের জন্য। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে প্রেস-কনফারেন্স চলল। তারা স্বদেশের সমাজ ব্যবস্থায় হতাশ হয়ে দেশত্যাগ করেছে। স্বদেশের নিন্দায় তারা মুখর হয়ে উঠল আর সোভিয়েট রাশিয়ার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

লণ্ডন, ব্রাসেলস্, প্যারিসের শ্রোতারা তো দুই মার্কিনীর প্রগল্‌ভতা শুনে হতবাক। তাহলে মার্কিন শ্রোতারা যে তাদের বিশ্বাসঘাতকতায় আরও অবাক হবে, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এই দুজনের বক্তব্যের রিপোর্ট প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের কাছে পেশ করা হল। তিনি বললেন অকালকুষ্মাণ্ড দুটোই বিশ্বাস-ঘাতক, দেশদ্রোহী। প্রেসিডেন্ট আদেশ জারি করলেন যে দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কড়া ও ত্রুটিহীন করা হোক।

অ্যামেরিকাবাসীর মুখ দিয়ে অ্যামেরিকার নিন্দা করাতে পেরে সোভিয়েট সরকার উল্লসিত। মাত্র চার মাস আগে তারা অ্যামেরিকার স্পাই প্লেন ইউ-টু নামিয়ে দিয়ে পাইলট ফ্র্যান্সিস গ্যারি পাওয়ার্সকে ধরেছিল; রাশিয়ানরা দাবি করেছিল যে মার্কিন সরকার তাদের আকাশে স্পাই প্লেন পাঠিয়ে অন্যায় করেছে, এমন প্রচার তারা করতে পেরেছে, তারপর মিচেল ও মার্টিন।

সোভিয়েট রাশিয়ার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। অ্যামেরিকার সমাজ

ব্যবস্থায় অনেক গলদ আছে, সেখানকার মানুষ হতাশায় ভুগছে এমন একটা প্রচার করাতে পেরে খারলামভ তথা বৈদেশিক মন্ত্রক খুশি।

প্রেস-কনফারেন্স শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বোগডানভ আবার খারলামভকে টেলিফোন করে বলল, আমার ও তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, এখন ছোঁড়া দুটোকে তুমি কোথাও রাখবার ব্যবস্থা কোরো। পরে দেখা যাবে ওদের নিয়ে কি করা যায়।

সোভিয়েট গুপ্তচর সংস্থা এক বিরাট ও জটিল ব্যবস্থা। কত নীতি, চক্র ও চক্রান্ত এখানে ভাঙাগড়া চলছে। এই বিরাট ও জটিল চক্রের মধ্যে পিয়টর মিখাইলোভিচ বোগডানভকে বাইরের কেউ চেনে না। কিন্তু তার নাম যারা শুনেছে তারা নির্দোষ হলেও ভয়ে কেঁপে ওঠে। কে জানে কোথায় সে কবে কোন্ বেফাঁস কথা বলে ফেলেছে হয়তো। সেই কথা সে নির্দোষভাবে বলে থাকলেও কোনো চরের কানে গেছে এবং তার ডাক পড়ল বোগডানভের দফতরে। তার সেই উক্তির গুরুত্ব বিবেচনা করে বিচার হবে। বিচারে যদি ধরা পড়ে সে এমন কিছু বলেনি তাহলে শুধু তার মগজ ধোলাই করে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয় আর যদি হানিকর কিছু বলে থাকে তাহলে তাকে 'লিকুইডেট' করে দেওয়া হয় অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ড এবং বিনা বিচারেও অনেকক্ষেত্রে।

প্রিমিয়ার কমরেড ক্রুশ্চফের যে কয়েকজন বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি আছে তাদের মধ্যে বোগডানভ একজন। কেজিবি চক্রের মধ্যে অনেকবার ওলটপালট হয়েছে, অনেকে বাতিল হয়েছে যথা ইয়েজভ, বেরিয়া, সেরভ এবং শেলেপিন কিন্তু বোগডানভ টিকে গেছে।

সে যে টিকে গেছে তার অন্যতম কারণ সে অত্যন্ত নিষ্ঠুর। বিনা বাক্যব্যয়ে সে তিনশ স্পাইয়ের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে, অনেকক্ষেত্রে শুধু সন্দেহের বশে, অনুসন্ধান না করেই। এরা সকলেই রুশচর বা এজেন্ট। বোগডানভের অধীনে যারা কাজ করে তাদের পদমর্যাদা যাইহোক না কেন তারা সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকে।

বিদেশেও তার হস্ত প্রসারিত। সেখানেও তার নির্দেশে সন্দেহভাজন বহু ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে। তারা সকলে কিন্তু রুশ নয়। যাদের মনে হয়েছে রাশিয়ার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে তাদেরই পরপারে যেতে হয়েছে। একথা অবশ্য মানতে হবে যে বোগডানভ নিষ্ঠুর হোক আর যাইহোক সে একজন দক্ষ অফিসার। তার কাছে কোনো গলতি নেই। তার আর একটা গুণ হল যে ওপরওয়ালার আদেশ সে বিনা বাক্যব্যয়ে ও বিনা প্রশ্নে অবিলম্বে পালন করে।

বোগডানভের বাল্য বা ছাত্রজীবন সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। যখন তার বয়স মাত্র বাইশ তখন সে কিয়েভ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিল।

সাংকেতিক ভাষা আজকাল স্পাই ভাষায় যাকে বলা হচ্ছে সাইফার বা সিক্রেট কোড সে সম্বন্ধে বোগডানভ গবেষণামূলক উৎকৃষ্ট একটা প্রবন্ধ রচনা করে। সেই প্রবন্ধ কমরেড স্ট্যালিনের নজরে পড়েছিল।

স্ট্যালিন এন কে ভি ডি-র প্রধান ইয়েজভ মারফত বোগডানভকে বলে পাঠান যে সোভিয়েট রাশিয়ার জন্যে সে এমন একটা সিক্রেট কোড তৈরি করুক যা কেউ ভাঙতে পারবে না।

বোগডানভ কৃতকার্য হয়েছিল এবং তার রচিত সিক্রেট কোড দীর্ঘ নয় বছর পর্যন্ত কেউ ভাঙতে পারেনি। ভেঙেছিল ব্রিটিশ মিলিটারি ইনটেলিজেন্সের অফিসাররা।

কিয়েভ টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট থেকে বোগডানভকে এন কে ভি ডি দফতরে আনা হয়েছিল ঐ কোড তৈরি করার জন্যে। ইয়েজভের অধীনে সে কাজ করছিল কিন্তু ইয়েজভকে গুলি করে হত্যা করা হয়। তার স্থলে নিযুক্ত হল ল্যাভরেন্টি বেরিয়া।

বেরিয়ার অত্যন্ত উচ্চাভিলাষ ছিল ফলে তাকেও মরতে হল। অনেকে বলে পলিটব্যুরোর মিটিং চলার সময় ক্রুশ্চফ হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে স্বয়ং রিভলভার থেকে গুলি করে তাকে হত্যা করেছিল।

বেরিয়া একদিন বোগডানভকে ডেকে পাঠিয়ে বলল, কমরেড বোগডানভ তুমি তো তোমার সব কাজ একাই কর, তাই না? আমার এইরকম একজন লোকের দরকার। আমি চাই তুমি সারকফের ওপর নজর রাখ। বিশেষ করে অফিসের বাইরে সে কি করে তার রিপোর্ট আমাকে দেবে।

এ সারকফ আমাদের পূর্ব পরিচিত সারকফ নয়, এ হল ভ্লাডিমির সারকফ বা জারকফও বলা যায়। পদমর্যাদায় এই জারকফের স্থান বেরিয়ার পরেই এন কে ভি ডি-র নাম্বার-টু। জারকফ প্রচুর সুরা পান করে, নারীর প্রতি দুর্বলতাও আছে।

বোগডানভ বেশ কয়েকদিন ধরে জারকফকে নজরে রাখল। সে কোথায় যায়, কি করে, কাদের সঙ্গে মেলামেশা করে বোগডানভ সব লক্ষ্য করতে লাগল। জারকফকে বুঝতেই দেয়নি যে কেউ তাকে অনুসরণ করছে।

বেরিয়ার কাছে বোগডানভ রিপোর্ট করল, 'জারকফ সুরা পান করলেই বক্ বক্ করে খুব বেশি কথা বলে। জ্নামস্কি পাড়ায় একটি ফ্ল্যাটে জারকফ প্রায়ই মেরিয়া আনাতোলি নামে আকর্ষণীয়া একজন রমণীর সঙ্গে দেখা করে, কিছু সময়ও তার ফ্ল্যাটে কাটায়। ঐ রমণী মোজেস্কা রেস্তরাঁয় গ্রাহকদের চিত্ত বিনোদন করে, গান গায়, নাচে।

ঐ মেরিয়া আনাতোলির জার্মান এমব্যাসিতে একজন অ্যাটাশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে। ঐ অ্যাটাশের নাম ফন রিখটার।

রিপোর্ট শুনে বেরিয়ার মুখ গম্ভীর হল। কিছুদিন থেকেই বেরিয়া সন্দেহ করছিল রাশিয়ার কিছু কিছু গুপ্ত খবর জার্মানরা জানতে পারছে। তাহলে সূত্র হল জারকফ ও সেই রমণী।

বোগডানভকে বেরিয়া বলল, তোমার খবর ঠিক। আমার সন্দেহ সত্য প্রমাণিত হল। আমি চাই তুমি জারকফকে লিকুইডেট কর, তাকে খতম করে দাও।

বোগডানভ কোনো কথা বলল না কিন্তু 'যো হুকুম' ধরনে ঘাড়

নাড়ল। একজনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হল এবং সেই দণ্ড তাকেই হাসিল করতে হবে কিন্তু বোগডানভের চোখে মুখে কোনো চাঞ্চল্য দেখা গেল না। তাকে যেন বলা হল 'এক কাপ কফি খেয়ে এস তো হে'।

এইটে তাকে প্রদত্ত প্রথম কাজ তো তাই বোধহয় জিজ্ঞাসা করল, কাজটা কিভাবে করব এবং কোথায়?

বেরিয়া তাকে একটা অটোম্যাটিক রিভলভার দিয়ে বলল, যত শীঘ্র সম্ভব আমি দেখতে চাই যে জারকফ আর মেরিয়া দুজনেই ইহজগত থেকে অপসারিত হয়েছে।

রিভলভারটা জামার পকেটে রাখতে রাখতে বোগডানভ ভাবল এটা শুধু আদেশই নয়, বেরিয়া তাকে পরীক্ষা করে নিতে চায়।

বোগডানভ তখনি হ্যানস স্যানডাউকে ডেকে পাঠাল। হ্যানসের ট্রেনিং কবে শেষ হয়ে গেছে। কয়েকটা কাজও সে নৈপুণ্যের সঙ্গে করেছে। তার কোনো বিকার বা দুঃখ নেই। সে ভাবে এরা আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে অতএব হত্যা করায় আমার কোনো পাপ নেই। তাকে ইউনিফর্ম পরে বেশ ভালো দেখাচ্ছে। সে যে পয়লা নম্বরের একজন ঘাতক তা তার মুখ দেখে ধরা যায় না।

হ্যানস আসতে বোগডানভ তাকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে তার সঙ্গে যেতে বলল। বেরিয়া অর্ডার দেবার পর বোধহয় মাত্র পনেরো মিনিট পার হয়েছে। হ্যানসকে সঙ্গে নিয়ে বোগডানভ জারকফের ঘরে যেয়ে হাজির।

আগে খবর না দিয়ে জারকফের ঘরে এসে তার কাজের ব্যাঘাত ঘটানোর জন্যে বোগডানভ বিনীতভাবে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলল, মাটির নিচে যে সেল আছে সেই সেলে একটা টেলিফোন বসাতে হবে তাই কমরেড বেরিয়া বললেন সেলে নেমে আপনাকেই টেলিফোন বসাবার জায়গাটা দেখিয়ে দিতে। দয়া করে একবার যদি আসেন।

নিশ্চয়, কমরেড বেরিয়া যখন বলেছেন, চল।

জারকফ তখনি বোগডানভ ও হ্যানসের সঙ্গে মাটির নিচে মৃত্যু-কুঠুরিতে নামল। তখন সে জানে না কি ঘটতে যাচ্ছে।

কুঠুরিতে আগে নামল জারকফ তারপরে হ্যানস। বোগডানভ দরজার মাথায় দাঁড়িয়ে রইল। হ্যানস আগেই রিভলভারের নলে সাইলেনসার লাগিয়ে রেডি হয়েছিল। জারকফ কুঠুরিতে নামার সঙ্গে সঙ্গে হ্যানস পিছন থেকে তার মাথায় মোক্ষম স্থানে গুলি করল। এক গুলিতেই খতম।

ভুস্ করে একটা শব্দ হয়েছিল। সেই শব্দ শুনে বোগডানভ নিচে নেমে এসে লাশ দেখল। পাথরের মেঝের ওপর মুখ থুবড়ে মানুষটা পড়ে রয়েছে। বোগডানভ এই প্রথম নিষ্ঠুর একটা মৃত্যু দেখল। না, তার কোনো অনুশোচনা নেই। সে ওপরওয়ালার আদেশ পালন করেছে মাত্র।

হ্যানস জারকফের পা দুটো ধরে টানতে টানতে পাশেই খালি কুঠুরিতে লাশটা আপাতত জমা রাখল। যেন একটা মরা কুকুরের ঠ্যাং ধরে টানতে টানতে এনে ডাস্টবিনে ফেলা হল। তারপর পাথরের মেঝে থেকে রক্ত ধুয়ে মুছে সাফ করা হল।

বোগডানভ বেরিয়ার অফিসে ফিরে যেয়ে রিভলভারটা তার টেবিলে রাখল। বেরিয়া বলল, অস্ত্রটা তোমার কাছে রাখ, আবার দরকার হবে।

পরদিন সকালে মসকোভা নদীর ধারে জারকফের লাশ পড়ে থাকতে দেখা গেল। আকাশে তখন দু একটা শকুনি উড়ছিল। আর বিকেলে দেখা গেল ঐ নদীতেই মেরিয়া আনাতোলি আর ফন রিখটারের মৃতদেহ ভাসছে। নৌকাডুবি হয়ে তাদের মৃত্যু হয়েছে। ওরা দুজনে যখন নৌকাবিহার করছিল তখন বুঝি একটা লঞ্চ নৌকোটাকে ধাক্কা মেরে উলটে দিয়েছিল। দুজনেই সাঁতার জানত না, কেউ ওদের উদ্ধার করবার চেষ্টাও করেনি।

ঐ ঘটনার কয়েকদিন পরে একদিন বিকেলে বেরিয়া বোগডানভকে

টেলিফোন করে বলল, এজেন্ট মসোভাকে তোমার কাছে পাঠাচ্ছি। সাইফার সম্বন্ধে ওর বুঝি কিছু প্রশ্ন আছে।

কিন্তু কমরেড আপনি তো জানেন সাইফারের কাজ তো এখন এনকেভিডি-র একজন টিচার করছেন।

জানি, শোনোই না। এজেন্ট মসোভা পরপর কয়েকটা ব্যাপার ভণ্ডুল করেছে যার জন্যে আমাকে অসুবিধেয় পড়তে হয়েছিল, ওকে লিকুইডেট কর।

বেরিয়া ফোন নামিয়ে রাখল। বোগডানভ অপর একটা ফোনে হ্যানসকে তৎক্ষণাৎ তলব করল। হ্যানসকে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হয়।

এজেন্ট মসোভা আসতেই বোগডানভ নিরুত্তাপ স্বরে বলল, এই যে কমরেড আপনি এসে গেছেন, গুড, আপনি একটু কষ্ট করে আমার এই সহকারীর সঙ্গে বেসমেণ্টে কুঠুরিতে যান, ওখানে ডি-কোডিং মেসিনটার কি একটা গড়বড় করছে, একটু ঠিক করে দেবেন।

বেসমেণ্ট কুঠুরিতে কেউ গেলে সে যে আর ফিরে আসে না এ খবর কারও জানা নেই কারণ কেউ ফিরে এসে কুঠুরির রহস্যটা কাউকে বলার সুযোগ পায়নি।

মসোভাকে হ্যানস কুঠুরিতে নিয়ে যেয়ে যথারীতি তার মাথায় গুলি করে খতম করে দিল। পরে লাশ অন্যত্র চালান করে দেওয়া হল।

এরপর থেকে বোগডানভ হল বেরিয়ার একান্ত 'লিকুইডেটর'। এরপর কয়েক বছরের মধ্যে বেরিয়া অনেক হতভাগ্যকে বোগডানভের ঘরে পাঠিয়েছে কিন্তু কেউ ফিরে আসেনি। শুধু পুরুষ নয়, কয়েকজন মহিলাকেও হ্যানসের হাতে মরতে হয়েছে। অফিসে কেউ কেউ দেখত কমরেড বেরিয়ার ঘর থেকে অনেকে কমরেড বোগডানভের ঘরে যায় কিন্তু তারা আর ফিরে আসে না। কোথায় যায় তারা? এই প্রশ্ন কেউ কাউকে করবার সাহস পায় না।

বোগডানভকে এরপর সিক্রেট পুলিসের একটি বিশেষ বিভাগে-

বদলি করা হল। এই বিভাগে কাজ করবার সময় বোগডানভ স্বীকারোক্তি আদায় করবার এক পদ্ধতি তৈরি করে যা এনকেভিডি মহলে "কমরেড পিয়টর মেথড" নামে পরিচিতি লাভ করে।

লৌহ যবনিকার অন্তরালে কমিউনিস্ট দেশগুলির জেলখানায় কি ভাবে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে তা শেখাবার জন্যে বোগডানভকে উত্তর কোরিয়া, চীন, হাঙ্গেরি, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং পোল্যাণ্ডে পাঠানো হয়।

লৌহ যবনিকার বাইরের দেশগুলি এই 'কমরেড পিয়টর মেথড' সম্বন্ধে কিছু জানত না। জানা গেল, মিসেস এরিকা ওয়ালাখ নামে এক মহিলা মারফত। এই মহিলাকে রাশিয়ার কুখ্যাত লুবিয়াংকা বন্দীশালায় আটক থাকতে হয়েছিল।

এরিকার জন্ম জার্মানিতে। সে একদা জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বার ছিল। এরিকা পরে জার্মানিতে মার্কিন মিলিটারি সরকারের অফিসার রবার্ট ওয়ালাখের প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করে।

এরিকা পার্টির হয়ে কিছুদিন গুপ্তচরের কাজ করেছিল কিন্তু পার্টির কমরেডরা সন্দেহ করে এরিকা ডবল এজেন্টের কাজ করছে, উভয় পক্ষকেই সে খবর সরবরাহ করছে। এ তো ভীষণ অন্যায়। স্টেট সিকিউরিটি পুলিস তাকে গ্রেফতার করে জার্মানিতে এক জেলখানা থেকে আর এক জেলখানায় পাঠানো হতে লাগল। কোনো জেলখানাতেই বেশি দিন রাখা হত না। শেষ পর্যন্ত তাকে এনকে-ভিডি-র হাতে তুলে দেওয়া হল। ওরা এরিকাকে কুখ্যাত লুবিয়াংকা বন্দীশালায় আটক করে রাখল। তাকে একদিন গুলি করে হত্যা করা হবে। তারিখ ও সময় পরে জানানো হবে। অনিশ্চিত ভবিষ্যতে এরিকাকে ফেলে দেওয়া হল।

এরিকা আসলে ডবল এজেণ্ট ছিল না। অ্যামেরিকার হয়ে, সে কখনও গুপ্তচরগিরি করেনি। তারস্বীকারোক্তি আদায় করবার জন্যে দু' বছর ধরে তার ওপর শারীরিক ও মানসিক উৎপীড়ন চালানো হয়েছিল।

এরিকার কথায় পরে ফিরে আসছি। তার আগে 'কমরেড পিয়টর মেথড' সম্বন্ধে কিছু জেনে নেওয়া যাক।

বন্দীকে প্রথমে এত ছোট একটা কুঠুরিতে একা রাখা হত যার মধ্যে হাত পা ছড়িয়ে বসা দূরের কথা নড়াচড়া করতে বেশ বেগ পেতে হত। যেন একটা বাক্সের মধ্যে একজনকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। বন্দী লম্বা হলে সে সোজা হয়ে দাঁড়াতেও পারত না।

দাওয়াই বেশ কড়া। এই দাওয়াইয়ে কাজ না হলে পরের দাওয়াই হল বন্দীকে কি দিনে কি রাত্রে ঘুমোতে দেওয়া হবে না। শুধু তাই নয় একের পর এক অফিসার আসবে আর তাকে চব্বিশ ঘণ্টা ধরে জেরা করবে। এ পদ্ধতি ইংরেজ আমলে ভারতেও চালু ছিল। বোধহয় এই পদ্ধতি যার নাম গ্রিলিং সব দেশেই চালু আছে।

তারপর সময়টা যদি শীতকাল হয় তো বন্দীকে সামান্য সুতীর জামা পরিয়ে বা সময়ে সময়ে উলঙ্গ করেও সেলে ফেলে রাখা হত। দারুণ শীতে হিমশীতল সেলে বন্দীর যে করুণ অবস্থা হত তা কল্পনা করাও যায় না, তায় আবার রাশিয়ার শীত।

বিশেষ কয়েকটা কুঠুরী ছিল যার মধ্যে বন্দীকে ঢুকিয়ে জল ছেড়ে দেওয়া হত যতক্ষণ পর্যন্ত না জল তার চিবুক পর্যন্ত উঠত। বলা বাহুল্য শীতের দেশ হলেও গরম জল ছাড়া হত না, ঠাণ্ডা জল।

কি অপরাধে বন্দীকে আটক রাখা হয়েছে, কতদিন আটক রাখা হবে, তার বিচার হবে কি না কিছুই বলা হত না। মাঝে মাঝে বলা হত তোমাকে খতম করার দিন এগিয়ে আসছে। এইভাবে বন্দীকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতে ফেলে রাখা হত।

বন্দীকে শাসানো হত স্বীকারোক্তি না করলে তার বাবা, মা, ভাই, বোন, স্ত্রী বা সন্তানের ওপর অত্যাচার করা হবে। সময় সময় বন্দীর সামনেই তার নিকটজনের ওপর অত্যাচার চালানো হত। শোনা গেছে বন্দীর বোন বা স্ত্রীর ওপরে বন্দীর সামনে ধর্ষণ করা হত। বলাই বাহুল্য বন্দীকে কিছু পড়তে বা লিখতে দেওয়া হত না, কোনো খবরও

সরবরাহ করা হত না। এমন অন্ধকার ঘরে রাখা হত যে দিন কি রাত্রি বোঝাই যেত না।

পেট ভরে খেতে দেওয়া হত কিন্তু সে খাদ্যের কোনো পুষ্টিগুণ থাকত না যার ফলে বন্দী ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ত এবং চর্মরোগ ও অন্যান্য রোগও হত। মনের জোরও ক্রমশঃ কমে আসত।

আবার কখনও বন্দীর ওপর ভালো ব্যবহারও করা হত। ভাল খাদ্য, ভালো জামা, পড়বার বই বা কাগজ দেওয়া হত।

এইসব নানা চাপে পড়ে অনেক বন্দী স্বীকারোক্তি করত। সেই স্বীকারোক্তি যাচাই করে তার দণ্ডের ব্যবস্থা করা হত। স্বীকারোক্তি করলেই যে বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ডও দেওয়া হত।

এরিকা মুক্তি পেয়েছিল এবং সে অ্যামেরিকায় এসে একটা বিবৃতিও দিয়েছিল।

এরিকা বলেছিল ঃ আমাকে পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রি ধরে অবিরাম জেরা করা হয়েছিল। যারা জেরা করত তাদের মধ্যে কেউ কেউ অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করত, গালাগালও দিত। তারা আমার কাছে কোনো কথা বার করতে পারেনি। কি করে পারবে ? আমি তো কিছু করিনি, ওদের সন্দেহ অমূলক।

এতে যখন কাজ হল না তখন ওরা আমাকে একটা ঠাণ্ডা কুঠুরিতে উলঙ্গ করে ফেলে দিল। কোনো কোনোদিন রাত্রে আমাকে একটা পাতলা জালি শার্ট দেওয়া হত। যেন আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছে। ঘরের মেঝে ছিল পাথরের, হাতে ভারি হাতকড়া লাগিয়ে দিয়েছিল। চিড়িয়াখানার জানোয়ার দেখবার মতো অনেকে আমাকে বাইরে থেকে দেখত, হাসাহাসি করত বা বিদ্রূপ করত।

এরিকাকে প্রশ্ন করা হল, হাতকড়া কি চব্বিশ ঘণ্টাই লাগানো থাকত।

হ্যাঁ, রাত্রে শুধু পাঁচ মিনিট খুলে দেওয়া হত আর যখন আমাকে

জেরা করবার জন্যে কোথাও নিয়ে যাওয়া হত তখন আমাকে জামা-প্যাণ্ট পরতে দেওয়া হত আর হাতকড়া খুলে দেওয়া হত। যে ঘরে নিয়ে যাওয়া হত সে ঘরে রুম হিটার থাকত। একটু উষ্ণতা ও আরাম ভোগ করতুম। এইটুকু সময় ভালো লাগত।

ন্যাকামো করে আমাকে প্রশ্ন করা হত, নিচে তোমার ঘরটা খুব ঠাণ্ডা নাকি?

আমি কোনো জবাব দিতুম না। এই রকম চলেছিল ষোলো দিন। আমাকে খেতে দেওয়া হত চারদিন অন্তর। আমাকে বলা হল 'তোমাকে শিগগির গরম ঘরে পাঠাব, জামাকাপড় পরতে দোব, খেতেও দোব দৈনিক, তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা হবে। কিন্তু তোমাকেও নরম হয়ে সব স্বীকার করতে হবে নইলে তোমাকে তোমার চিবুক পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে রাখা হবে। থাকতে পারবে তো?'

এই অমানুষিক অত্যাচার সহ্য না করতে পেরে এরিকা হয়তো শেষ পর্যন্ত যাহোক একটা স্বীকারোক্তি করে ফেলত কিংবা কে জানে হয়ত পাগল হয়েই যেত কিন্তু এই সময়ে স্ট্যালিন মারা গেলেন।

লুবিয়াংকা বন্দীশালা থেকে তাকে সাইবেরিয়ায় ভোরকুটা স্লেভ লেবার ক্যাম্পে বদলি করা হল। প্রায় দু বছর পরে তাকে আবার লুবিয়াংকা বন্দীশালায় ফিরিয়ে আনা হল। এবার তার বিচার হল। অভিযোগ গুপ্তচরবৃত্তি নয়, সে নাকি অ্যামেরিকার প্রশংসা করে বেড়িয়েছে আর সোভিয়েট রাশিয়ার নিন্দে করেছে। তাঁকে পাঁচ বছরের কিছু বেশি বিভিন্ন স্লেভ লেবার ক্যাম্পে খাটিয়ে মুক্তি দেওয়া হয়।

বোগডানভের ধারণা ছিল যে পুরুষ অপরাধী অপেক্ষা মেয়ে অপরাধী ভেঙে পড়তে বেশি সময় নেয়। হয়তো একথা সত্যি কারণ এত অত্যাচারেও এরিকা ভেঙে পড়েনি। যতদূর জানা যায় এরিকা বোগডানভকে প্রায় পরাজিত করেছিল। আর কেউ বোগডানভের

অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করতে পারেনি হয় তারা প্রাণ দিয়েছিল কিংবা স্বীকারোক্তি করেছিল।

এরিকা তার স্বামীর সঙ্গে অ্যামেরিকা চলে গিয়েছিল। পরে স্বামী-পুত্র নিয়ে সুখের সংসার গড়ে তুলেছিল।

স্ট্যালিনের মৃত্যুর পরে এনকেভিডি-র মধ্যে ওলটপালট করা হয়। আসলে এনকেভিডি হল কেজিবি-র আগেকার সংগঠন। এনকেভিডি ভেঙে হয় এমজিবি এবং এমজিবি ভেঙে কেজিবি। কেজিবি আরও ব্যাপক, তার ক্ষমতাও বেশি। শত শত এজেন্ট, স্পাই ও সিক্রেট পুলিসকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এই সময়ে হ্যানসের কোনো কোনো দিন দশবার পর্যন্ত ডাক পড়ত।

নতুনভাবে এনকেভিডি গড়ে তোলা হল। ওপরওয়ালারা বললেন হ্যানসের বৌকে আর ক্যান্টিনে কাজ করতে দেওয়া হবে না। সে এখন থেকে এনকেভিডি-র কাজ করবে। অ্যানালিসা ইংরেজি জানত, ফরাসিও কিছু বলতে ও বুঝতে পারত, তাই যে হোটেলে বিদেশীদের তোলা হত সেই হোটেলে তাকে কাজ দেওয়া হল। সে ভান করবে সে ইংরেজি জানে না কিন্তু হোটেলে যেসব ইংরেজ, অ্যামেরিকান বা ফরাসীরা উঠবে তাদের কথাবার্তা শুনবে এবং এনকেভিডি-র বিশেষ একটি ব্যক্তির কাছে রিপোর্ট করবে। মাইনেও বাড়িয়ে দেওয়া হল। হোটেলের সব খাবারও সে পাবে, ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, টি ও ডিনার। মাঝে মাঝে ভোদকাও পাবে তবে বোতল নয়। হোটেলের বারে মাঝে মাঝে চুমুক দিতে পারে।

এনকেভিডি-র মধ্যে অনেক ওলটপালট হল কিন্তু বোগডানভ রয়ে গেল। ক্রুশ্চভ আগে থেকেই তাকে পছন্দ করতেন তাছাড়া যতই নিষ্ঠুর হোক কাজে বোগডানভের নিষ্ঠা ছিল এবং ওপরওয়ালাদের আদেশ বিনা প্রশ্নে তৎক্ষণাৎ পালন করত। সাংকেতিক ভাষা গঠনে তার অবদান স্বীকৃত হয়েছিল এবং সে যত বেশি স্পাই ধরতে পেরেছিল এত

বেশি স্পাই আর কেউ ধরতে পারেনি। রেড আর্মির উচ্চপদস্থ অফিসাররাও তাদের কাজের উচ্চ প্রশংসা করেছিল। বোগডানভকে কর্নেল-জেনারেল পদে উন্নীত করা হয়।

এনকেভিডি-র ভেতরে এই ওলটপালট এবং হত্যালীলার খবর বাইরের জগতেও পৌঁছেছিল, রুশ সরকার খবর চেপে রাখতে পারেনি। লৌহ যবনিকা পার হয়ে আরও খবর দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, যেমন ক্রেমলিনের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব আর ক্ষমতার লড়াই চলছে। ক্রেমলিনের ব্যাপারে বেরিয়া বড় বেশি নাক গলাচ্ছে যদিও তার অনুগত সকল সহচরকে এ জগৎ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তবুও বেরিয়া বাড়াবাড়ি করছে। শেষ পর্যন্ত বেরিয়া টেকেনি। সে কথা আগেই বলা হয়েছে।

ক্রেমলিনের ভেতরে লড়াই চললেও একটা বিষয়ে পলিটব্যুরো সজাগ ছিল। অ্যামেরিকা এবং ইংলণ্ডের গুপ্তচররা রাশিয়ায় রীতিমতো সক্রিয়। বিশেষ করে রাশিয়া বর্তমানে যে ইণ্টারকণ্টিনেণ্টাল মিসাইল বা দূরপাল্লার ক্ষেপনাস্ত্র তৈরি করছে সে খবর ইংলণ্ড ও অ্যামেরিকা জেনে ফেলেছে।

এমন মিসাইল তৈরি করা হয়েছে যে রাশিয়ায় বোতাম টিপলে সেই মিসাইল অন্য রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট শহরে বা বন্দরে যেয়ে ফাটবে। এগুলির মাথায় অ্যাটম বোমার মতো প্রচণ্ড শক্তিশালী বিস্ফোরক বসানো আছে। একটি মিসাইল একটা বন্দর, শহর, নৌঘাঁটি বা বিমানবন্দর উড়িয়ে দিতে পারে।

রাশিয়া আর কি কি মারাত্মক অস্ত্র, ট্যাংক, সাবমেরিন বা বিমান ইত্যাদি তৈরি করছে সেসব খবরও বিদেশে পৌঁছে গিয়েছিল। মারাত্মক অস্ত্র ইত্যাদি সম্ভবত তৈরি হয় চেকোশ্লোভাকিয়াতে। অস্ত্র তৈরি করতে চেকরা নিপুণ। তাছাড়া চেকোশ্লোভাকিয়াতে আছে স্কোডা এবং আরও কয়েকটি বিরাট কারখানা। একমাত্র জার্মানির ক্রুপ কারখানাই স্কোডার চেয়ে বড়।

যাতে আর খবর গুপ্তচর মারফত বিদেশে পৌঁছতে না পারে এজন্যে সোভিয়েট ইণ্টারনাল সিকিউরিটি বিভাগেও অদলবদল করা হল। জেনারেল আইভান সেরভ হলেন এই বিভাগের সুপ্রিম হেড। বিভাগটিকে সংক্ষেপে বলা হয় কে আই।

চরিত্র ও ব্যবহারের দিক থেকে সেরভ হল বেরিয়ার বিপরীত, শান্ত, মৃদুভাষী কিন্তু ধূর্ত। অনেক বিষয়ে বোগডানভের সঙ্গে মিল আছে। কাজের ভার নিয়ে সেরভ লক্ষ্য করল যে 'কমরেড পিয়টর মেথড' খুব কার্যকরী হয়েছে। বেশ কয়েকজন অ্যামেরিকানকে এই দাওয়াই দেওয়া হয়েছিল। তারা এখন সোভিয়েট রাশিয়ার সমর্থক।

সেরভ একদিন বোগডানভকে ডেকে বলল, এতদিন তোমরা কড়া দাওয়াই দিয়ে বন্দীদের অপরাধ স্বীকার করিয়েছ কিংবা তাকে মেরে ফেলেছ কিন্তু বন্দীরা বিশেষ করে মার্কিন বা ইংরেজ বন্দী নিজে কি জানত সেটা তার মুখ দিয়ে বলাবার চেষ্টা করনি। তারাও হয়তো অনেক গুরুত্বপূর্ণ খবর জানত। এবার থেকে আমাদের এদিকে মন দিতে হবে।

বোগডানভ বেরিয়ার আদেশমতো কাজ করেছে। বন্দী অপরাধ স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে হয় তাকে কঠোর সাজা দেওয়া হয়েছে কিংবা হ্যানসের শিকার হয়েছে।

সেরভ নির্দেশ দিল এবার থেকে বন্দীর স্বীকারোক্তি ছাড়া তার কাছে কি তথ্য আছে তা জানতে হবে। তাদের মুক্তি দিয়ে ডবল এজেণ্ট করবার চেষ্টা করতে হবে। আরও একটা কাজ করতে হবে, আমাদের বিজ্ঞানীরা যে-সব কাজ করছে তার অনেক কিছু বাইরে পাচার হচ্ছে, এটা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। বিশেষ করে আমাদের সন্ধানী ক্ষেপণাস্ত্রের কোনো খবরই যাতে শত্রু দেশের হাতে না পৌঁছয়।

বোগডানভের দফতর থেকে তখনি সারা সোভিয়েট রাশিয়ায় এবং সোভিয়েট রাশিয়া অধিকৃত রাষ্ট্রগুলিতে আদেশ জারি করা হল যে

কোনো অ্যামেরিকান বা ব্রিটিশ এজেন্ট ধরা পড়লে তাকে যেন অবিলম্বে কড়া পাহারায় এবং গোপনে সোজা মস্কো পাঠানো হয়।

এই আদেশ অনুসারে রাশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন কমিউনিস্ট বা কমিউনিস্ট অধিকৃত দেশ থেকে অনেক অ্যামেরিকান ও ব্রিটিশ এজেন্ট মস্কো পাঠানো হয়েছিল। 'কমরেড পিয়টর' দাওয়াই প্রয়োগ করার পর কতজন স্বীকারোক্তি করেছিল, স্বদেশের গুপ্ত তথ্য সরবরাহ এবং পরে ডবল এজেন্ট হয়েছিল তার সংখ্যা জানা যায়নি তবে বেশ কয়েকজন ডবল এজেন্ট হয়েছিল। বোগডানভ এদের কাজে লাগিয়ে অ্যামেরিকানদের ধোঁকা দিতে পেরেছিল।

ডবল এজেন্ট যারা হয়েছিল, উত্তমরূপে তাদের মগজ ধোলাই করা হয়েছিল। সুফলও পাওয়া গিয়েছিল।

অ্যামেরিকার ইনটেলিজেন্স দফতর যখন এইরকম কোনো ডবল এজেন্টকে রাশিয়ার সন্ধানী ক্ষেপণাস্ত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করত এবং জানতে চাইত রাশিয়া কি পরিমাণ ঐ অস্ত্র তৈরি করছে তখন এজেন্ট জবাব দিত, না, রাশিয়া এখন তো সন্ধানী ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করছে না। হাইড্রোজেন বোমা বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে তারা দূরপাল্লার বিমান তৈরি করছে।

তাই নাকি? অ্যামেরিকা তখন ক্ষেপণাস্ত্রের উৎপাদন কমিয়ে দিয়ে দূরপাল্লার জঙ্গী ও নিউক্লিয়ার বোমা বয়ে নিয়ে যাবার উপযুক্ত বিমান তৈরি করতে আরম্ভ করল আর রাশিয়া ওদিকে মিসাইল উৎপাদন বাড়িয়ে দিল।

সেরভের চালে মার্কিনরা আপাতত ঠকে গেল। পরে যখন অন্য সূত্র থেকে আসল ব্যাপার প্রকাশ হয়ে পড়ল তখন অ্যামেরিকা বেশ কয়েক কোটি ডলার বিমান তৈরি করতে ব্যয় করে ফেলেছে। যে বিমানগুলি তৈরি করা হয়েছে সেগুলি হয়তো নির্দিষ্ট কাজে লাগবে না।

মতলবটা সেরভের, কিন্তু সেই মতলব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেছে বোগডানভ এজন্যে তার মর্যাদা বেড়ে গেল। সেরভ বুঝল বোগডানভ

কাজের লোক তাই সে এবার বোগডানভের ওপর একটা বিপজ্জনক কাজের ভার দিল। বিপজ্জনক এই হিসেবে যে এই কাজ সম্পাদন করতে যাওয়া মানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মার্শাল জুকভের এলাকায় হস্তক্ষেপ করা। খুব সাবধানে এগোতে হবে একটু এদিক ওদিক হলেই সেরভ ও বোগডানভ দুজনেরই বিপদ ঘটবে। কারণ মার্শাল জুকভ শুধু প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নন তিনি সোভিয়েট রাশিয়ার একজন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। সেনাপতি হিসেবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।

ব্যাপারটা হল এইরকম: রাশিয়া অধিকৃত পূর্ব বারলিন থেকে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির সিকিউরিটি প্রধান অফিসার আর্নস্ট উলওয়েবারের কাছ থেকে একটা রিপোর্ট পেলেন যে ওখানে মোতায়েন সোভিয়েট আর্মির জেনারেল স্টাফের মেজর জেনারেল ইগর ট্রোপানভ মার্কিন অধিকৃত পশ্চিম বারলিনে প্রায়ই যায় এবং সেখানে অ্যামেরিকান ও ব্রিটিশ অফিসারদের সঙ্গে মেলামেশা করে, সুরা পান করে। এছাড়া এমন কয়েকজন সুন্দরী লাস্যময়ী যুবতীর সঙ্গে মেলামেশা করে যারা মার্কিন ইনটেলিজেন্স দফতরের বেতনভুক অর্থাৎ স্পাই। বলা বাহুল্য এর ফলে রুশ নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে, অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

সেরভ ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝলেন এবং যেহেতু সামরিক বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার জড়িত সেজন্য ব্যাপারটা মার্শাল জুকভের সামনে পেশ করা উচিত। কিন্তু নিশ্ছিদ্র প্রমাণ চাই নচেৎ সমূহ বিপদ। এছাড়া মার্শাল জুকভ রাশভারি ও জবরদস্ত ব্যক্তি। তাঁর বিভাগে অন্য কোনো বিভাগের ব্যক্তির, তা সে যেই হোক না কেন— তার নাক গলানো তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করেন না। সিকিউরিটি চিফ সেরভ হলেও নয়। তাই ট্রোপানভ সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ চাই।

সেরভ বোগডানভকে ডেকে ব্যাপারের গুরুত্ব বুঝিয়ে তাকে বারলিনে যেয়ে উলওয়েবারের সঙ্গে মিলিত হয়ে উভয়ে মিলে

ব্যাপারটার ফয়সালা করতে বললেন।

বোগডানভ পরদিনই পশ্চিম বারলিনে উড়ে গেল। শান্ত একটি হোটেল যার নাম কণ্ডি সেই হোটেলে উঠল। নাম লেখাল হামবুর্গ থেকে আগত হের অটো ব্রেখট। রুশ পরিচয় গোপন রেখে জার্মান হিসেবে পরিচয় দিল।

সেরভের নির্দেশ সত্ত্বেও বোগডানভ কিন্তু উলওয়েবারের সঙ্গে দেখা করল না। সে নিজেই ট্রোপানভকে নজরে রাখল। ট্রোপানভ কোথায় কোথায় যায়, কোন্ কোন্ অ্যামেরিকান ও ব্রিটিশ অফিসারের সঙ্গে দেখা করে, কোন্ কোন্ মেয়েকে নিজের বেডরুমে বা কোনো হোটেলে তোলে সব তথ্য সংগ্রহ করল। যাচাই করে দেখল উলওয়েবার সঠিক রিপোর্ট দিয়েছে।

বোগডানভ পূর্ব বার্লিনে যেয়ে জার্মান কমিউনিস্টদের সিকিউরিটির হেডকোয়ার্টারে উলওয়েবারের সঙ্গে দেখা করল। তাকে বলল, তোমার কাজ প্রশংসনীয়। ট্রোপানভ যা করছে তাতে তাকে এখনই লিকুইডেট করা অবশ্যই উচিত।

উলওয়েবার নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক। একজনকে লিকুইডেট করতে হবে শুনেই তার চোখ চক্‌চক্ করতে লাগল। যাকে বলে স্যাডিস্ট, উলওয়েবার হল সেই প্রকৃতির মানুষ। কোনো নারীকে রমণ করবার আগে সে তাকে প্রহার করে, উৎপীড়ন করে নানাভাবে তা নইলে রমণ করে সে নাকি তৃপ্তি পায় না। সাতান্ন বছর বয়স হয়ে গেল তবুও তার রমণেচ্ছা শান্ত হয়নি এবং নরহত্যার প্রবৃত্তিও। সুযোগ পেলেই সে মানুষ খুন করে এজন্যে তার একটা ডাকনাম আছে, 'টটস্ল্যাগার' অর্থাৎ ঘাতক।

বোগডানভ বলল, আমরা এখনও এমন কোনো অকাট্য প্রমাণ পাইনি। প্রমাণ না পেয়ে লিকুইডেট করলে বিপদে পড়ব।

উলওয়েবার চুপ করে রইল।

বোগডানভ বলল, মেজর জেনারেল ট্রোপানভ মিলিটারি জেনারেল

স্টাফের মেম্বার। তাঁর কাছে এক খণ্ড 'সোভিয়েট আর্মি অর্ডার অফ ব্যাটল' বই আছে। এই বই মাত্র দুশো কপি ছাপা হয়েছিল এবং কেবলমাত্র উচ্চপদস্থ মিলিটারি অফিসারদের দেওয়া হয়েছিল, আর পলিটব্যুরোর কোনো কোনো ভাগ্যবানকে দেওয়া হয়েছিল। ডিফেন্স মিনিস্টারের কড়া আদেশ আছে যে এই বই হারালে বা খোয়া গেলে কঠোর শাস্তি পেতে হবে আর যদি মিত্রশক্তির হাতে পড়ে তাহলে তো মৃত্যুদণ্ড। ঠিক আছে, উলওয়েবার আমার একজন তুখোড় স্পাই চাই।

আছে কমরেড, আমার চেনা সেইরকম একজন মেয়ে স্পাই আছে যে আমার জন্যে মার্কিন সৈনিকদের কাছ থেকে চারবার গুরুত্বপূর্ণ খবর সংগ্রহ করে এনেছিল!

না, তাকে দিয়ে আমার কাজ হবে না। সে তার কোনো মার্কিন বন্ধুর কাছে কাজটা ফাঁস করে দিতে পারে। আমি চাই সেইরকম একজন মেয়ে স্পাই যে আকর্ষণীয় হবে, বুদ্ধিমতী হবে এবং যাকে খারিজ করা যাবে।

উলওয়েবার বুঝল বোগডানভ পাকা লোক। ঠিকই বলেছে। ও খুঁজেপেতে গ্রেটা নামে একটি জার্মান যুবতীকে নিয়ে এল। বেডরুমের উত্তম অভিজ্ঞতা তার আছে। যে-কোনো পুরুষকে বুকে তোলবার ক্ষমতা আছে। নানা কায়দাকানুনও জানে, চটুল, কিন্তু চপল নয়, বুদ্ধিমতী। কথা বলে বোগডানভ বুঝল এ মেয়ে ট্রোপানভকে ঘায়েল করতে পারবে।

গ্রেটারও উচ্চাভিলাষ আছে, সে চায় ফিমেল এজেন্টদের সর্বোচ্চ স্তরে উঠতে তার জন্যে সে সব কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত।

গ্রেটা বলল, কমরেড মেজর, আপনাদের কিছু করতে হবে না, আমিই মেজর জেনারেল ট্রোপানভের সঙ্গে আলাপ করে আপনাদের কাজ উদ্ধার করে দেবে।

দু-একদিন পরে গ্রেটা বোগডানভকে বলল, আপনারা কাল শেষ রাত্রে হোটেল কেমপিনিসকির লাউঞ্জে আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন।

আপনারা যা চেয়েছেন তা পাবেন।

বোগডানভ বলল, হোটেলের লাউঞ্জে নয়। হোটেলের সামনে যে বাড়ি আছে আমরা তার পোর্টিকোর নিচে তোমার জন্যে অপেক্ষা করব। আমরা দু'জন একটা গাড়িতে বসে থাকব। তুমি হোটেল থেকে বেরিয়ে সোজা গাড়িতে এসে উঠবে।

গ্রেটা সেদিন সন্ধ্যায় মেজর জেনারেল ট্রোপানভকে নিয়ে প্রথমে একটা কাফেতে যেয়ে বেশ কিছুক্ষণ কাটাল। গল্প করল, খাওয়া-দাওয়া করল, সুরাপান করল তারপর দু'জনে হোটেলে এসে উঠল।

হোটেলেও একপ্রস্থ সুরাপান চলল। গ্রেটা যত না পান করল তার চেয়ে বেশি পান করবার ভান করল এবং এক ফাঁকে মেজর জেনারেলের সুরার সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিল আর নিজে জেগে থাকবার জন্যে একটা ডেক্সিড্রিন ট্যাবলেট খেল।

শেষ রাত্রে দেখল মেজর জেনারেল অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

ভোর হবার ঠিক আগে গ্রেটা উঠে তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে সোজা রাস্তার ওপরে যেয়ে অপেক্ষমান গাড়িতে উঠে 'সোভিয়েট আর্মি অর্ডার অফ ব্যাটলফিল্ড' বইখানি বোগডানভের হাতে তুলে দিল।

বোগডানভ বলল, ফ্লাইন তুমি খুব তাড়াতাড়ি উত্তম কাজ করেছ, চল, আমরা এখন সিকিউরিটি অফিসে যায়, সেখানে তোমাকে পারিতোষিক দোব।

বোগডানভ গাড়িতে স্টার্ট দেবার আগে উলওয়েবার গাড়ি থেকে নেমে গেল। বোগডানভ গাড়ি ছেড়ে দিল। উলওয়েবার সেই হোটেলে ঢুকলো। ট্রোপানভের ঘরে গিয়ে দেখল সে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। পকেট থেকে সাইলেনসার লাগানো নয় মিলিমিটার রিভলবার বার করে ট্রোপানভের মাথায় একটা ও হার্টে একটা গুলি করল।

আর ওদিকে গ্রেটাকে সিকিউরিটি হেডকোয়ার্টারের একটা সাউণ্ড-প্রুফ ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। সে কিছুই সন্দেহ করেনি। ঘাতক বোধহয় আগেই ঘরে রেডি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গ্রেটা ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার পিছন দিকে গুলি করা হল। গ্রেটা মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল। এক গুলিতেই খতম। বেচারী জানতেও পারল না কি পারিতোষিক সে লাভ করল।

ট্রোপানভ হত্যার কথা মার্শাল জুকভের কানে উঠল। তিনি তো ভীষণ রেগে গেলেন এবং পূর্ণ তদন্ত দাবি করলেন। বোগডানভ তাঁকে শান্ত করল। সমস্ত রিপোর্ট দাখিল করে বলল যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের নির্দেশ আছে যে উক্ত বইখানি কোনো অফিসারের হস্তচ্যুত হলে সেই অফিসারকে তৎক্ষণাৎ লিকুইডেট করা হবে অতএব তারা বেআইনী কোনো কাজ করেনি।

মার্শাল জুকভ সন্তুষ্ট না হলেও শান্ত হয়েছিলেন। তাঁর ক্ষোভ হল, ট্রোপানভ বা গ্রেটা নামে মেয়েটিকে হত্যার আগে তাঁকে একবার জানানো হল না কেন?

বারলিন থেকে ঘুরে এসে বোগডানভ কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন বা কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক কিছু ব্যক্তিকে মস্কোয় এনে তাদের মগজ ধোলাই করে সোভিয়েট রাশিয়ার কাজে লাগিয়েছিল।

বিখ্যাত ডবল এজেণ্ট কিম ফিলবির দুই বন্ধু গাই বার্জেস ও ডন ম্যাকনিলকে সে ইংলণ্ড থেকে পালাতে সাহায্য করেছিল। ওরা নিরাপদে মস্কোয় পৌঁছেছিল।

এই দুজনের আগে কিম ফিলবি বেইরুট থেকে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে রাশিয়ায় চলে আসে। গাই বার্জেস ও ডন ম্যাকনিল কোন্ পথ দিয়ে মস্কো এসেছিল তা জানা গিয়েছিল কিন্তু কিম ফিলবি সকলের চোখে ধুলো দিয়ে কিভাবে ভ্যানিশ হয়ে গেল ও মস্কো এসে পৌঁছল তা দীর্ঘদিন জানা যায়নি।

বোগডানভের আর একটি কৃতিত্ব হল ইটালির বিখ্যাত বিজ্ঞানী ব্রুনো পন্টিকরভোকে ইংলণ্ড থেকে মস্কো আনা। এজন্যে সে নিজেও ইংলণ্ডে গিয়েছিল।

ডঃ ব্রুনো পন্টিকরভোর জন্ম ইটালিতে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ও অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিল পন্টিকরভো। বিশিষ্ট পারমাণবিক বিজ্ঞানী মাদাম কুরির জামাতা নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী ফ্রেডরিক জোলিও কুরি এবং নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত আর একজন ইটালিয় বিজ্ঞানী স্বনামধন্য এনরিকো ফার্মির সঙ্গে সেও কাজ করেছিল তবে ইটালিতে নয় অ্যামেরিকায়। অ্যাটম বোমা নির্মাণের সময় পন্টিকরভো প্রমুখ অনেক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অ্যামেরিকায় ম্যানহাটান প্রজেক্টে কাজ করেছিল।

অ্যাটম বোমা নির্মাণ কৌশল যখন গুপ্তচর মারফত রাশিয়ার হস্তগত হল তখন যে-সব বিজ্ঞানী বা ব্যক্তিদের সন্দেহ করা হয়েছিল তাদের মধ্যে ডঃ ব্রুনো পন্টিকরভো একজন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধবার আগে পন্টিকরভো স্বদেশ ছেড়ে অ্যামেরিকা ও ক্যানাডার কয়েকটি বিশিষ্ট ল্যাবরেটরিতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিল। অ্যাটমিক সায়েন্টিস্ট হিসেবে সে খ্যাতি অর্জন করেছিল। পরে সে ইংলণ্ডে চলে আসে এবং ব্রিটিশ নাগরিকত্ব গ্রহণ করে ইংলণ্ডের বিখ্যাত অ্যাটমিক রিসার্চ সেণ্টার হারওয়েলে কাজ করতে থাকে। এখান থেকে সে যায় অ্যামেরিকায় অ্যাটম বোমা নির্মাণ কেন্দ্র ম্যানহাটান প্রজেক্টে। পরে সে আবার ইংলণ্ডে ফিরে আসে।

বোগডানভের বেশি বন্ধুবান্ধব ছিল না। সামান্য দু-তিনজন যারা ছিল তাদের মধ্যে ছিল নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী ডঃ পিটার কাপিৎসা। কাপিৎসাও ইংলণ্ডে গবেষণা করত। সে লর্ড রাদার-ফোর্ডের প্রিয় ছাত্র ছিল। লর্ড রাদারফোর্ড যে কতবড় বিজ্ঞানী ছিলেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

রাশিয়া তখন পারমাণবিক গবেষণার জন্য কয়েকটি কেন্দ্র স্থাপন

করেছে। সাফল্যের সঙ্গে অ্যাটম বোমা তৈরি করেছে। এখন তাদের লক্ষ্য হাইড্রোজেন বোমা।

রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা বললেন ইংলণ্ড থেকে পিটার কাপিৎসাকে আনতে পারলে ভালো হয়, বোমাটি আরও কম সময়ে তৈরি করা যাবে। রাশিয়ার অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স এক বিজ্ঞান সম্মিলনীর জন্যে পিটার কাপিৎসাকে আমন্ত্রণ জানাল। কাপিৎসা রাশিয়ায় এলেন কিন্তু তাকে আর ইংলণ্ডে ফিরে যেতে দেওয়া হল না।

একদিন সন্ধ্যায় দাবা খেলবার সময় কাপিৎসা বোগডানভকে বলল, ইংলণ্ড থেকে ব্রুনো পন্টিকরভোকে আনতে পার? সে আমার সহযোগী হলে আমার কাজের সুবিধে হয়।

বোগডানভ বলল, এ আর শক্ত কি, আমি তাকে তোমার কাছে এনে দেব, কথা দিলাম।

বোগডানভ পরদিনই কাজে লেগে গেল। অ্যামেরিকা, ক্যানাডা, ইটালি, ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের সোভিয়েট দূতাবাসে জরুরী চিঠি পাঠিয়ে ডঃ ব্রুনো পন্টিকরভো সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য জানতে চাইল।

এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত খবর এসে গেল। এই বিজ্ঞানী সম্বন্ধে যে-সব তথ্য জানার দরকার ছিল সে-সবই জানা গেল। পেন্টিকরভো তখন হারওয়েলে কাজ করছিল। বোগডানভ জানতে পারল যে কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বার না হলেও পন্টিকরভো কমিউনিস্ট সমর্থক। এই পার্টির প্রতি তার পুরো সহানুভূতি আছে এবং কড়াকড়ি সত্ত্বেও ব্রিটিশ পুলিস তা জানতে পারেনি। জানতে পারলে সে বোধহয় হারওয়েলের মতো গুরুত্বপূর্ণ পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রে কাজ করবার সুযোগ পেত না।

পন্টিকরভো সম্বন্ধে সকল সংবাদ সংগ্রহ করে বোগডানভ বার্লিন গেল। জাল পাসপোর্ট নিয়ে এবং নিজেকে একজন জার্মান ভৌত বিজ্ঞানীর পরিচয় দিয়ে বোগডানভ বার্লিন থেকে লণ্ডন পৌঁছল।

লণ্ডন থেকে সে গেল হারওয়েলে। কর্তাদের কাছে বলল সে

ইস্ট জার্মানি থেকে পালিয়ে এসেছে, এখানে কোনো কাজ চায়। তারপর সে পল্টিকরভোর সঙ্গে গোপনে দেখা করে বলে যে তার কাছে খবর আছে ব্রিটিশ ও অ্যামেরিকার পুলিস শীঘ্রই তাকে গ্রেফতার করবে। তার আগে সে যদি মস্কো যেতে চায় তো বোগডানভ সব ব্যবস্থা করে দেবে এবং পল্টিকরভোকে এজন্যে কি করতে হবে তারও প্ল্যান তৈরি করে দিল। অবশেষে পল্টিকরভো মস্কো এসে পৌঁছল। (কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকা অ্যাটম স্পাইদের সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণের জন্যে লেখকের 'বিশ্বত্রাস অ্যাটম বোমা' বইখানি পড়তে পারেন)।

বোগডানভের আর একটা কৃতিত্ব। ফ্রগম্যান কমাণ্ডার লায়োনেল ক্র্যাবকে সে ইংলণ্ডের পোর্টসমাথ বন্দরে জলের তলা থেকে ধরে এনেছিল। ফ্রগম্যান ক্র্যাব কে? তাকে নিয়ে সারা পৃথিবীতে হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল কেন?

ক্রুশ্চেভ একটা রুশ ক্রুজারে চেপে ইংলণ্ডে এসেছেন। ক্রুজারটিকে পাহারা দেবার জন্যে একটা ডেস্ট্রয়ার জাহাজও এসেছে। জাহাজ দু'টি ইংলণ্ডের পোর্টসমাথ বন্দরে নোঙর করে আছে।

রাশিয়ার এই দ্রুতগামী ক্রুজার যুদ্ধজাহাজ ও টরপেডো নিক্ষেপকারী ডেস্ট্রয়ার সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্যে ইংলণ্ডের মিলিটারি ইনটেলিজেন্স বিভাগ ব্যগ্র হয়ে পড়ল।

প্রাথমিক অনুসন্ধানের জন্যে ফ্রগম্যান ক্র্যাবকে মনোনীত করা হল। ফ্রগম্যানরা বিশেষ ধরনের পোশাক পরে পিঠে অকসিজেনের ট্যাংক আটকে জলের তলায় বিচরণ করতে পারে।

এইজন্যে ক্র্যাবকে পোর্টসমাথ বন্দরে এনে স্যালিপোর্ট হোটেলে তোলা হল। একদিন ভোরে ক্র্যাব হোটেল থেকে বেরোল কিন্তু আর ফিরল না।

জলের নিচে অবাধে বিচরণ করবার জন্যে বিশেষ যে পোশাক তৈরি

করা হয়, যে-সব সরঞ্জাম দরকার হয় এবং জাহাজের তলদেশ সম্বন্ধে ক্র্যাবের প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল। এ বিষয়ে জানাশোনা মানুষ হিসেবে তার প্রচুর খ্যাতি ছিল। এসব নিয়ে সে অনেক গবেষণাও করেছিল। ব্রিটিশ নৌবাহিনীর জন্যে সে কিছু যন্ত্রপাতি তৈরি করে দিয়েছিল। ইংলণ্ডের টেডিংটনে নৌবাহিনীর যে গবেষণা কেন্দ্র আছে সেখানে ক্র্যাব গবেষণায় নিযুক্ত ছিল।

স্যালিপোর্ট হোটেল থেকে ভোরবেলায় ক্র্যাব সেই যে বেরিয়ে গেল তারপর দু'-দিন তার আর কোনো খবর নেই। তখন ক্র্যাবের আবাল্য বন্ধু আর্থার টমকিনস উদ্বিগ্ন হয়ে নৌবাহিনীর কোনো এক কর্তাকে ফোন করে ক্র্যাবের খবর জানতে চাইল।

অফিসার বললেন, তিনিও জানেন যে ক্র্যাব জলে নেমেছে এবং দু'দিন হয়ে গেল সে এখনও জল থেকে ওঠেনি তবে চিন্তার কোনো কারণ নেই, দু'-একদিন দেরিতে কিছু যায় আসে না।

আরও দু'-একদিন কাটল তবুও ক্র্যাবের কোনো খবর নেই। পোর্টসমাথে নানা গুজব ছড়িয়ে পড়ল, নানাজনে নানা কথা বলে, সন্দেহ প্রকাশ করে।

রুশ ক্রুজারে আর ডেস্ট্রয়ারে মোতায়েন প্রহরারত রক্ষীরা নাকি একজন ফ্রগম্যানকে জলে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে। কিন্তু সে গেল কোথায়? রুশরা কি ধরে নিয়ে গেল নাকি তাকে মেরে ফেলেছে?

গুজব শুধু পোর্টসমাথে আবদ্ধ রইল না, সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল। গুজব চাপা দেবার জন্যে দশ দিন পরে ব্রিটিশ অ্যাডমিরালটি যেন অনিচ্ছার সঙ্গে একটা বিবৃতি দিল যা সংক্ষেপে এইরকম:

> জলের নিচে কয়েকটা যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা করবার সময় কমাণ্ডার লায়নেল কে পি ক্র্যাব মারা গিয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে তবে পোর্টসমাথে নয় স্টোকস বে এলাকায়। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ন'-দিন আগে।

ক্র্যাব কিন্তু মরেনি। সে রুশদের হাতে ধরা পড়ে গিয়েছিল

এবং তাকে মস্কোয় নিয়ে যেয়ে বোগডানভের জিম্মা করে দেওয়া হয়েছিল।

জলের নিচে ব্যবহার করা যায় টর্পেডো বা অন্যান্য ক্ষেপণাস্ত্র সম্বন্ধে ক্র্যাবের প্রযুক্তিগত বিদ্যা ও অভিজ্ঞতার খবর রুশদের অজানা ছিল না তাই এমন একজন এক্সপার্টকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দেওয়া যায় না। তার মগজ ধোলাই করে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক তাকে কাজে লাগাতে পারবে।

পন্টিকারভো বা কাপিৎসা ইংরেজ নয়। তারা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে কিন্তু ক্র্যাব ইংরেজ এবং দেশপ্রেমিক। যুদ্ধের সময় কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্যে সে জর্জ মেডাল পেয়েছে। তাকে সহজে আয়ত্ত করা যাবে না। কড়া দাওয়াই দিতে হবে তা সেজন্যে তো বোগডানভ আছে। তাই তাকে বোগডানভের হাতে তুলে দেওয়া হল।

ক্র্যাব কি করে ধরা পড়ল এ নিয়ে নানা জল্পনা কল্পনা হয়েছিল। পাকা খবর দিয়েছিল বার্নার্ড হাটন। হাটন ইংরেজ কিন্তু তার জন্মকর্ম চেকোস্লোভাকিয়ায়। লৌহ যবনিকার ওপারে জানাশোনা মহলের সঙ্গে তার সরাসরি যোগাযোগ আছে।

ক্র্যাব কি করে ধরা পড়ল সে খবরটা হাটন ঐ সূত্র থেকে জানতে পেরেছিল। আগেভাগে খবর বা সন্ধান না নিয়ে জলে ঝুপ করে নেমে পড়া ক্র্যাবের ভুল হয়েছিল কারণ ঐ সময়ে রুশ ডেস্ট্রয়ারের নিচে চারজন রুশ ফ্রগম্যান কয়েকটা যন্ত্র বসাচ্ছিল।

ক্র্যাবকে দেখা মাত্রই ঐ চারজন রুশ ফ্রগম্যান ক্র্যাবকে খপ করে ধরে ফেলে তারপর তাকে জাহাজে তোলে। ডেস্ট্রয়ার থেকে তাকে ক্রুজারে স্থানান্তরিত করা হয় এবং তাকে জাহাজে বন্দী করে রেখে দেওয়া হয়।

নির্দিষ্ট তারিখে জাহাজ বন্দর ছেড়ে চলে যায়। উত্তর সাগরে জাহাজ যখন বেশ খানিকটা দূরে এসেছে তখন তাকে বার করা হল। বলা বাহুল্য যে ধরা পড়ার পর তাকে জাহাজে তুলে জেরা করা

হয়েছিল এবং পরে তাকে একটা মাদক দ্রব্য খাইয়ে নেশার ঘোরে রাখা হয়েছিল।

তাকে যখন তার কেবিন থেকে বার করে আনা হল তখনও তার নেশার ঘোর কাটেনি। সেই অবস্থায় তাকে বলটিক সাগরের এক বন্দরে নামিয়ে দেওয়া হল। বন্দরে ছিল একটা সোভিয়েট মিলিটারি প্লেন। সেই প্লেনে চাপিয়ে তাকে মস্কোয় চালান করে দেওয়া হল।

ক্র্যাবের এই ঘটনা নিয়ে বার্নার্ড হাটন একখানা বই লিখেছে যার নাম 'ফ্রগম্যান একস্ট্রডিনারি'। বইখানা অ্যামেরিকায় পরে 'ফ্রগম্যান পাই' নামেও প্রকাশিত হয়েছিল। সোভিয়েট সূত্র থেকে প্রাপ্ত খবরের ওপর নির্ভর করে হাটন বইখানা লিখেছিল।

অন্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত খবর হাটনের বিবৃতি সমর্থন করেছে।

রাশিয়ার ভেতরে আর একটা গুপ্তচর চক্র আছে, তার সংক্ষিপ্ত নাম এন টি এস, পুরো নাম নরোডনা ট্রুডোভয় সোয়ুজ। এই চক্র সোভিয়েট সরকারের নয়। এদের কাজ হল সোভিয়েট সরকার ও অভ্যন্তরীণ ব্যাপারের গোপন খবর সংগ্রহ করা। এটি অ-কমিউনিস্ট আণ্ডারগ্রাউণ্ড চরচক্র। এন টি এস রাশিয়ার খবর সংগ্রহ করে রাশিয়ার বাইরে পাঠায়। সোভিয়েট সরকারকে অপদস্থ করা এদের কাজ। এই চরচক্র এতই সুসংগঠিত যে ক্রেমলিনের ভেতরেও এদের চর আছে।

এন টি এস-এর একজন চর মস্কো থেকে কোপেনহ্যাগেন হয়ে লণ্ডনে এসে ব্রিটিশ মিলিটারি ইনটেলিজেন্সকে খবর দিল যে ক্র্যাবকে লুবিয়াংকা বন্দীশালায় ৬৩ নম্বর সেলে একা অর্থাৎ সলিটারি কনফাইনমেণ্টে রাখা হয়েছে। তার নামও পালটে দেওয়া হয়েছে। বন্দীশালায় তার নাম হল লেভ লোভিক কোরাব্লভ।

ক্র্যাব অনাহার, অপুষ্টি, মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে বোগডানভের কাছে নতি স্বীকার করেছিল। তখন নতুন নাম দেওয়া হল এবং ক্র্যাব এই নামে রুশ নৌবাহিনীর রিসার্চ

বিভাগে কাজ করতে রাজি হল। তাকে রুশ ভাষাও শেখানো হল।

একজন প্রাক্তন ব্রিটিশ নেভাল অফিসার যার নাম ইভান স্কিলেন এবং যে একদা জিব্রালটারে ক্র্যাবের সঙ্গে কাজ করেছিল, সে রাশিয়া বেড়াতে গিয়েছিল।

মস্কোর ককেশাস রেস্তরাঁয় ঢুকে সে ক্র্যাবকে দেখে চিনতে পেরে ডেকে ওঠে, কমাণ্ডার ক্র্যাব, সত্যিই কি তুমি! কিন্তু শুনেছি যে তুমি নাকি মারা গেছ? তা কি করে হয়? এই তো তোমাকে স্পষ্ট দেখছি।

ক্র্যাবের পরনে ছিল রেড আর্মির ইউনিফর্ম, একজন মহিলার সঙ্গে সে ভোজন করছিল। ক্র্যাবের মুখের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যা দেখে তাকে চিনতে ভুল হয় না যেমন তার পুরু ও অবিন্যস্ত ভুরু, চোখের পাতা যেন ঝুলে থাকে, নাকের গর্ত বেশ বড়, সরু ঠোঁট। তবে এখন তাকে রোগা মনে হচ্ছে।

স্কিলেন টেবিলের কাছে এগিয়ে যেয়ে বলল, হ্যালো ক্র্যাব, আমাকে চিনতে পারছ?

ক্র্যাব ও তার সঙ্গের মহিলা উভয়েই স্কিলেনের দিকে মুখ তুলে চাইল। ক্র্যাব যে স্কিলেনকে চিনতে পেরেছে তেমন মনে হল না।

ক্র্যাবের সঙ্গে যে মহিলাটি ছিল সে ক্র্যাবের বান্ধবী নয়। সে একজন সার্জেণ্ট, পরনে ইউনিফর্ম, হয়তো ক্র্যাবের রক্ষী। সেই মহিলা বলল, তুমি ভুল করছ। ইনি হলেন কমরেড লেভ লোভিক কোরাব্লভ আর আমি সার্জেণ্ট ভিরা স্যাভেলিয়েভা।

তথাপি স্কিলেন নিঃসন্দেহ, বলল, না, এ কমাণ্ডার ক্র্যাব, দেখি আমি কথা বলে।

ক্র্যাব বা কোরাব্লভ তখন সঙ্গী সার্জেণ্টকে রুশ ভাষায় কিছু বলল। তার কথা বলার ধরন দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে রুশ ভাষা তার মাতৃভাষা নয় এবং ভাষাটা এখনও আয়ত্ত করতে পারেনি।

সার্জেণ্ট ভিরা বলল, কমরেড তোমাকে বলতে বলছে যে তুমি ভুল করছ। ও সে ব্যক্তি নয়।

ক্র্যাবের সঙ্গে স্কিলেন একা কথা বলবার চেষ্টা করল কিন্তু বিফল হল কারণ মহিলা সার্জেণ্ট ক্র্যাবকে দ্রুত উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল। সার্জেণ্টের ভয় হল ক্র্যাব যদি ভেঙে পড়ে, যদি স্বীকার করে ফেলে তাহলে তো সর্বনাশ হয়ে যাবে।

স্কিলেন হতভম্ব। সে ইংলণ্ডে ফিরে এসে খবরের কাগজের রিপোর্টারদের বলল, ড্যাম্ ইট, আমি নিশ্চিত লোকটা ক্র্যাব, এত ভুল আমার হবে না। পাশাপাশি ওর সঙ্গে কতদিন কাজ করলুম আর ওকে চিনতে ভুল করব কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ওকে আমি একা পেলুম না।

এরপর কয়েকটা মাস কেটে গেল এবং এই কয়েক মাসে ক্র্যাবকে অমুক জায়গায় দেখা গেছে বা সে অমুক কাজ করছে, এই রকম কিছু রিপোর্ট পাওয়া গেল।

শেষ রিপোর্টটি দিল এক ব্রিটিশ মালবাহী জাহাজের ক্যাপটেন, নাম উইলিয়ম র‍্যাপ। র‍্যাপ বলছে যে ভ্লাডিভস্টক বন্দরে তার জাহাজে যখন মাল বোঝাই হচ্ছিল এবং সে যখন মাল বোঝাই তদারক করছিল সেই সময় সে দেখে যে ক্র্যাব একদল রুশ ফ্রগম্যানকে কিছু নির্দেশ দিচ্ছে। তার চিনতে ভুল হয়নি কিন্তু তার কাছে যাওয়ার উপায় ছিল না।

এই সকল খবর বোগডানভও শুনল। সে সেরভকে বলল, কমাণ্ডার ক্র্যাবের ব্যাপারটা মিটিয়ে দেওয়া ভালো। এমন কিছু করা যাক যাতে ইংরেজরা বিশ্বাস করে যে তাদের কমাণ্ডার ক্র্যাব অনেক আগেই ইহলোক ত্যাগ করেছে।

সেরভ জিজ্ঞাসা করল, কি করবে?

সে ব্যবস্থা আমি করব।

১৯৫৭ সালের ১০ জুন সকালে ব্রিটিশ নৌবহরের একজন কর্মী

জন র‍্যাণ্ডাল পোর্টসমাথ হারবার থেকে বারো মাইল দূরে চিচেস্টার হারবারে জলে নৌকো ভাসিয়ে মাছ ধরছিল। ওখানে ছোট একটা দ্বীপ ছিল। পিলসে দ্বীপ। সে যখন নৌকো বেয়ে ঐ দ্বীপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল সেই সময়ে দ্বীপে সমুদ্রের জল ঘেঁসে অদ্ভুত একটা কিছু পড়ে থাকতে দেখা গেল। র‍্যাণ্ডালের সন্দেহ হল ওটা মানুষ বা কোন পশুর মৃতদেহ হতে পারে। ওটা সম্ভবত জলে ভাসতে ভাসতে দ্বীপের কূলে আটকে গেছে।

কৌতূহলী হয়ে র‍্যাণ্ডাল নৌকো নিয়ে কাছে যেয়ে দেখল সেটা একটা মানুষের মৃতদেহ, তার পরনে ফ্রগম্যানের স্যুট কিন্তু তার গলা ও দুই হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। হতে পারে কোনো সামুদ্রিক জীব ওগুলি খেয়ে ফেলেছে কিংবা ইচ্ছে করে কেউ কেটে বাদ দিয়েছে। সামুদ্রিক জীব কি বেছে বেছে শুধু হাত দুটোই খাবে? একটা পাও তো খেতে পারত।

মৃতদেহে কয়েকটা চিহ্ন দেখে র‍্যাণ্ডালের সন্দেহ হল লাশটাকে চেনে বেঁধে কোনো জলযান সমুদ্রের ভেতর দিয়ে টেনে এনেছে। এটা কি হারিয়ে যাওয়া সেই ফগম্যান ক্র্যাবের লাশ?

কাছেই আছে রয়েল এয়ারফোর্সের থর্নি এয়ারপোর্ট। র‍্যাণ্ডাল লাশটাকে তার নৌকোয় তুলে এয়ারপোর্টে নিয়ে গেল। এয়ারপোর্টের অফিসাররা পুলিসে খবর দিল।

তদন্ত চলল। মুণ্ডহীন দেহ সনাক্ত করা সম্ভব নয় যদি না মৃতের দেহে কোথাও বিশেষ কোন চিহ্ন থাকে। সেরকম কোনো চিহ্নের কথা পুলিসের জানা নেই।

পুলিস তখন ক্র্যাবের প্রাক্তন স্ত্রী মিসেস মার্গারেট ক্র্যাবকে ডেকে পাঠাল। মার্গারেট ক্র্যাবের সঙ্গে তিন বছর আগে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল। মার্গারেট মৃতদেহ দেখে বলল, এই লাশ কমাণ্ডার ক্র্যাবের নয়। কারণ ক্র্যাবের ডান পায়ের বুড়ো আঙুল পাশের আঙুলের সঙ্গে জোড়া ছিল অতএব এ দেহ ক্র্যাবের নয়।

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটা চাপা দেবার উদ্দেশ্যেই হয়তো ঐ লাশটাই কমাণ্ডার লায়নেল ক্র্যাবের মৃতদেহ বলে পোর্টসমাথে কবর দিল।

ক্র্যাবের ব্যাপার নিয়ে ইংলণ্ড তথা সারা পৃথিবীতে খুব হৈ চৈ হয়েছিল কিন্তু পরিণতি জানা যায়নি। জানা গেল হ্যানস স্যানডাউ মারফত।

হ্যানস ও তার স্ত্রী রাশিয়ায় পাঁচ বছর ছিল তারপর ওরা ফিরে আসে। ওরা ইংলণ্ডের সেই গ্রামেই বাস করছে।